—কত মানুষ অবিনাশ নিজে এইখানে পোড়াইয়া গেছে। লোকজন আসিয়া অশ্বথের এই শিকড়ের উপরেই বসে। গাছটা বহুকালের প্রাচীন। নদীর চরে কত পোড়া কাঠ, কত কয়লা, কত খাট-বালিশ পড়িয়া থাকে, কিন্তু সে-বছর আর থাকে কেমন করিয়া?—বানের ঘোলাটে জল আসিয়া সে সব একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।...বিষ্টু দাস, জগৎ বোরেগী, রাধু কামার—তিন জনেই মরিয়াছে গত শীতের সময়। নদীতে তখন জল ছিল না। শুক্‌নো বালি ধূ ধূ করিত। হরিদাসের ছোট বোন্‌টাও এই সেদিন গেল। বর্ষার ঠিক আগেই।

......মেয়েটার মরা-মুখখানি এখনও তাহার মনে পড়ে। এক পিঠ চুল—পায়ে আল্‌তা, সিঁথিতে সিঁদুর! আগুনে আর গায়ের রংএ যে এক হইয়া যায়—তাহা সে সেদিন স্বচক্ষে দেখিয়া গেছে। রূপের বড়াই করিয়া লাভ কি?

কিন্তু এ-ঘাটে যাহারা পার হয়, ও-ঘাটে তাহারা গিয়া আর পৌঁছায় না হয়ত'।

কিন্তু......না।

একজন গিয়াছে—চেষ্টা করিলে এখনও যাহার সন্ধান মিলে......

তুলুসী। হাঁ, তুলসীই তার আসল নাম। আদর করিয়া অবিনাশ ডাকিত—সুন্দরী।

—"শুন্‌চিস্ বৌ, আল্‌খেল্লা আল্‌খেল্লা ত করচিস্, এবার থেকে তুলুসীর মালা পরব গলায়।"—অবিনাশ রাগাইত।

বৌএর সে কি রাগ! এ-ঘর ও-ঘর করিতে করিতে ঘোম্‌টার ফাঁকে রাগের হাসি হাসিয়া চোখ টিপিয়া বৌ বলিত, "থাক্। পায়ে রেখেছ সেই ভাল, আবার গলায় কেন?"

অবিনাশও ছাড়িত না; রসিকতা করিয়া গান ধরিত,

"পায়ে নয় মাথায় রাধে, শ্যাম তোরে মাথায় রেখেছে।
পায়ের ঘুঙুর হাতের বাঁশী, কেঁদে কেঁদে তোরেই ডেকেছে,
রাধে—তোরেই সেধেছে—!"

বৌ হয়ত পিছন ফিরিয়া উনানের কাছে গিয়া বসিত। উনানে হয়ত ভাত চড়িয়াছে।

কাঠি দিয়া বৌ তাহাই নাড়িতে সুরু করে। আর গান শুনিয়া হাসে।

হাসি আর তাহার বন্ধ হয় না।

পিছন ফিরিয়া বসিলেও অবিনাশ তাহা টের পায়। ভাতের কাঠি জোরে জোরে নড়ে, চুড়ির ঠিন্ ঠিন্ আওয়াজ হয়, পাৎলা শাড়ীর তলায় খোঁপার প্রজাপতি ঝিক্ ঝিক্ করে, চুরি করা হাসির ধমকে আপাদ মস্তক নড়িতে থাকে!

কিন্তু সে সব চুকিয়া গেছে।

এই নদীর ঘাটে চুকিয়া গেলেই যেন ভাল হইত।

নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া রামদেও হুঁকা টানিতেছিল।

—চুলওয়ালা মিস্ত্রি না?

হুঁকাটি রাখিয়া রামদেও নামিয়া পড়িল।

কাছে গিয়া বলিল, "এ শালা হারামী কাজ আবার করে!"

"কি হলো কি?"—মিস্ত্রি মুখ তুলিল।

নৌকার মাথার দিকে আবার নাকি একটা ফুটা বাহির হইয়াছে। পেরেক্-পাটাতন আর একবার না করিয়া দিলেই নয়!

রামদেওএর পিছু পিছু মিস্ত্রিকে উঠিতে হইল।—"চল, দেখি!" দেখিল ফুটা সামান্তই। জোড়ের মুখে একটুখানি ফাট ধরিয়াছে। পাটাতন না দিলেও চলে। দু'টা পেরেক্ ঠুকিয়া দিলেই চলিবে।

হাতুড়ি পেরেক্ নৌকাতেই মজুত। ঘা-কতক ঠুকিয়া দিয়া মিস্ত্রি বলিল, "বাস্—ছুট!"

রামদেও ঘুরিয়া ফিরিয়া উপরে নীচে অনেকবার

করিয়া দেখিল। বলিল, "এ বছর লোকসানের পাল্লা দাদা! আজ ত দেখি গতিক খারাপ।"

"কি রকম?"

নদীতে নাকি সাদা ফেন্ দেখা দিয়াছে। পশ্চিমের হড়্পা বান আসিতে আর দেরি নাই।—আজ রাতে হোক্, কাল হোক্—আসিবেই। খেয়া পারাপার কত দিনের জন্য বন্ধ থাকে কে জানে!

"আজ আর তোমার এই ঘরে তুমি থেকো না মিস্ত্রি!"

অবিনাশ হাসিল।—"কেন?"

হড়্পা আসিলে বিশ্বাস কি, বানের জল তাহার ঘর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

নিতান্ত উদাসীনের মত অবিনাশ বলিল, "উঠুক্।"

বলিয়াই সে একবার নদীর পানে তাকাইল। দু'কানা বান চলিতেছে।

"ওইটা ঘূর্ণী না?"

রামদেও বলিল, "ঘুরণ্-চাকি এ বছর যেখানে সেখানে মিস্ত্রি, ঘুরণ্-চাকির ভাবনা নাই। এই ঘুরণ্—ওই ঘুরণ্—আর ওই আর একটা,—আর দু-ই দেখ বড় ঘুরণ্! ওইখানে পড়েই সেদিন আমার সেই বড় নৌকো—"

হড়্ হড়্ করিয়া বানের শব্দে আর কিছু শোনা গেল না। নৌকার উপর দাঁড়াইয়া রামদেও আঙুল বাড়াইয়া দেখাইতেছিল।

...অসম্ভব বানের জোর! পশ্চিম হইতে ঘোলা জল কেবলই ছুটিয়া আসে—ঘূর্ণীতে পড়িয়া চাকার মত একবার ঘুরপাক্ খায়—আবার চলে!

অবিনাশ একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিল।

পশ্চিমে—শুধু জল আর জল......আকাশের সেই শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত! দূরে মাত্র আবছা কয়েকটা গাছপালা দেখা যায়। আর একটা সাদা-ধবধবে দালান বাড়ীর খানিকটা। কয়লা-কুঠির সেই ছ্যাংচা সাহেবের বাড়ী।

"খোঁড়া সেই মেকিন্‌টোশ সায়েবের বাড়ী না?"

রামদেও বলিল, "হাঁ হাঁ খোঁড়া মিকিন্‌জি! সায়েবের পয়সা আছে।"

মিস্ত্রি তাহা জানে। রাণীগঞ্জ শহরে গিয়া একবার সে তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।—ঠেঙো ছুটো খাঁটি মেহগিনির তৈরী; যেমন কালো, তেমনি চক্‌চকে!

তাহারই বাড়ী দেখা যায়।

সাঁওতালের একটা মেয়ে লইয়া ওইখানেই সাহেব নাকি তাহার ঘর সংসার পাতিয়াছে।

আর সেই ঘরের মাথায় দিনান্তের সূর্য্য তখন রাঙা হইয়া উঠিতেছিল।

রাত্রি তখন কত—পাড়া-গাঁয়ের লোকে কেই-বা খবর রাখে?

সন্ধ্যা হইতেই আকাশে আবার বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছিল।

অবিনাশ চারটি মুড়ি খাইয়া বিছানায় শুইল। কেইবা রাঁধে!

অন্ধকার ঘরের ভিতর একাকী শুইয়া চোখ বুজিয়া শুধু তাহার কথা ভাবিতে বেশ লাগে......

কিন্তু ঘুম—সে ত আসিবেই!

কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে জানিতেও পারে নাই। মানুষের ঘুম বুঝি এমনি নিঃশব্দেই আসে।

ক্রমাগত মেঘগর্জ্জনের মত প্রচণ্ড শব্দ! হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিসের শব্দ?

অবিনাশ চুপ করিয়া কান পাতিয়া রহিল। মনে পড়িল, রামদেও বলিয়াছিল—হড়্পা বান আসিতে পারে। হয়ত তাই।

মনে হইবামাত্র ধড়্মড়্ করিয়া অবিনাশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার......

রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যায় না।—অস্পষ্ট, ঝাপসা!

শব্দ যেন ক্রমাগত আগাইয়া আসিতেছে। বানের শব্দ। অবিনাশ প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া একবার পলাইতে চাহিল।

কিন্তু না। চালার খুঁটি ধরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সে মরিবে।

চোখের সুমুখে আসন্ন মৃত্যু! মানুষ আর কেমন করিয়া বুক বাঁধিয়া দাঁড়ায়! মরিবার আগেই মৃত্যু যেন তার গলা টিপিয়া ধরিল। জলের ভিতর মানুষ কেমন করিয়া মরে? কত জল খায়—বাঁচিবার জন্য কত চেষ্টা করে—অসহ্য যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে,—তাহার পর দুই হাত দিয়া প্রাণটাকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া ছিঁড়িয়া চলিয়া যায়!

অবিনাশ ছুটিয়া আবার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে কিছুই ঠিক-ঠাহর করিবার উপায় নাই। উঠানের একপাশে বাঁশের একটা চালায় ঢেঁকি পোঁতা ছিল। অবিনাশ তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়া ঢুকিল।

আলোর কোথাও এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! আকাশে তারা ছিল না। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল।

আবার বুঝি বিদ্যুৎ চমকায়!

নির্জ্জীবের মত দেওয়ালের একপাশে ঢেঁকিটা পড়িয়া আছে। এই ঢেঁকির মাথায় দাঁড়াইয়া সুন্দরী পাহার দিত। একটি পা থাকিত ঢেঁকির মাথায়, আর এক পা মাটিতে। উপরে ওই বাঁশের ধরনীতে হাত দিয়া সে যেন এক অপরূপ ভঙ্গীতে তাহার নাচন্ সুরু করিত। তালে তালে ঢেঁকির শব্দ উঠিত।

অবিনাশ বলিত, "ঢেঁকি তৈরী এদ্দিনে আমার সার্থক হলো।"

তুলসী বলিত, "হ্যাঁ আমাকে নাকে-দমে খাটিয়ে নিয়ে। কোমর কাঁকাল্ ধরে গেল।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিত, "না বাপু তুই সব জিনিসই উল্‌টো বুঝিস।"

তুলসী বলিত, "তোমার মত সোজা ত নই!"

বানের শব্দ আর যেন অবিনাশের কানে ঢুকিল না।

মনে হইল, অন্ধকারে চোখের সুমুখে এখনও যেন সে ওই ঢেঁকির মাথায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আলতা-পরা সুন্দর একখানি পা রহিয়াছে ঢেঁকির মাথায়। পায়ের কাপড় হাঁটু অবধি উঠিয়া গেছে। চমৎকার নিটোল দু'খানি সুগোল পা যেন তাহার চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল;—সুন্দর সুস্পষ্ট তাহার সেই সম্পূর্ণ অবয়ব খানি!

তাহার পর কি হইল কে জানে......

বাঁচিবার জন্য বৃথা চেষ্টা! আর কতক্ষণই বা আছে! অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না—কিন্তু নিজেকে ঠিক দেখা যায়।

ভীষণ দামোদরের দু'কানা তুফানের উপর নিজে সে কতটুকুই বা!

সে বছর সেই বান-ভাসির সালে ঘর তখন তাহার এখানে ছিল না—সে ত স্বচক্ষে দেখিয়াছে—কত গরু-ঘোড়া কত মহিষ-ভেড়া কত প্রকাণ্ড জানোয়ার এই বানের জলে ভাসিয়া আসে। বাঁচিবার জন্য সে কি প্রাণান্ত প্রয়াস তাহাদের! কথা কহিতে পারে না—নিরুপায় জীবগুলি শুধু ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ডোবে আর ওঠে! কত মানুষের আস্ত মড়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঢাক হইয়া তাহাদের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। বড় বড় কত কাঠ, কত পাথর, কত গাছ, কত ঘর বাড়ী, গড়াইতে গড়াইতে শোলার মত ভাসিয়া চলে, কত গ্রাম কত সহর, ভাসিয়া আসে।

আজও সে যে আসিয়াছে—একা আসে নাই। ঘুমন্ত হটুকির কত নরনারী কত গরু-মোষ কত ছাগল-ভেড়া যে আসিয়াছে কে জানে—

আস্ত একটা খড়ো ঘরের চালার উপর শালের একটা খোলা হাতের মুঠায় প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া অবিনাশ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ ভিজা। কোমরের কাপড়টা কোনরকমে জড়ানো আছে মাত্র—খালি গা—মাথায় এক মাথা চুল ভিজিয়া ড্যাব্ ড্যাব্ করিতেছে, মুছিবার অবসর নাই!

অন্ধকার রাত্রি। দু'দিকে অথই জল, শুধু থই থই

করে—মাথার উপরে মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়—দুএক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে,—বানের হড়্‌হড়ানিতে কান বন্ধ হইয়া আসে। অবিনাশের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে।...মৃত্যুর পূর্ব্বে এম্‌নিই বুঝি হয়!

ঘরের চালাটা কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতেছিল। কি আশ্রয় করিয়া সে যে এখনও বাঁচিয়া আছে অবিনাশ নিজেও বেশ ঠিক-ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। কোথায় চলিয়াছে কে জানে......

হাতের আশ্রয়টুকু ঘুচিয়া গেলেই শেষ!

দামোদরের বুকের তলায় কোথায় যে সে তলাইয়া যাইবে,—গড়াইতে গড়াইতে মৃতদেহ যে তার কোন্‌ ঘাটে গিয়া লাগিবে কিছুই বলিবার জো নাই।

মরণ সে চাহিয়াছিল না?

চাহিয়াছিল বই কি! জীবনের সব কিছু ভুলিয়া গিয়া মরণের কোলে একটুখানি বিশ্রাম! চাহিয়াছিল—জীবনের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়া অনন্ত শান্তি!

কিন্তু এত অশান্ত ভীষণ যে মরণের রূপ সে কথা আগে কে জানিত?

জানিলে চাহিত কি?

প্রাণপণে অবিনাশ তাহার হাতের খুঁটিটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকায়!

আকাশে আর জলে যেন সব একাকার হইয়া গেছে।

কিছুদূর গিয়া মনে হইল হাতের আশ্রয়টা কোথায় যেন আটকাইয়া গেছে।

বানের জল দুপাশ দিয়া হড়্‌হড়্‌ করিয়া চলে, খড়ো ঘরের ভাসা চালটা আটক খাইয়া থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপে। অবিনাশেরও সর্ব্বাঙ্গে তখন কাঁপুনি ধরিয়াছে।

কোথায় আটকাইয়া গেল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

অবিনাশ এদিক ওদিক তাকায়। সূচিভেদ্য অন্ধকার যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে!

মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে কে জানে! অবিনাশ অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে একটা হাত ছাড়িয়া তাহার বুকে একবার হাত দিয়া দেখিল; নিজের হাতের দিকে একবার তাকাইল। না—মরে নাই।

কিন্তু এই অস্বস্তিকর আঁধার কি কাটিবে না আজ? ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায় না?

প্রভাতের অপেক্ষায় অবিনাশ ঊর্দ্ধে আকাশের পানে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

চালাটা আর নড়ে না। বানের প্রবল ধাক্কায় মাঝে-মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

নিকটেই কোথায় যেন একটা গাছের পাতা সর্‌ সর্‌ করিয়া নড়িতেছিল। তবে কি কিনারে আসিয়া লাগিল না কি?

একটি বিদ্যুতের অপেক্ষায় অবিনাশ আবার একবার আকাশের দিকে মুখ ফিরাইল। অন্ধকারে সব যেন থম্‌ থম্‌ করিতেছে। আকাশের সব বিদ্যুৎ সব আলো বুঝি-বা ফুরাইয়া গেল।

পাশেই যেন কোথায় ঠিন্‌ ঠিন্‌ করিয়া আওয়াজ হইতেছে। ঠিক্‌ যেন চুড়ির শব্দ! সুন্দরী নয় ত! তুলসী!

অবিনাশ ডাকিল, "কে?"

কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই যেন সে চমকিয়া উঠিল।

বানের সেই একঘেয়ে হড়্‌হড়্‌ শব্দ!

দূরে অন্ধকার আকাশের খানিকটা যেন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

বুঝি-বা সূর্য্য ওঠে!

আশায় আনন্দে অবিনাশ সাগ্রহে সেই রক্তিম আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়—সূর্য্য আর ওঠে না!

* * *

মিলুটির ইস্পাতের কারখানা ওইদিকেই না?

কিন্তু এই বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে দিক-দিগন্ত ঠাহর করিবে কে?

ও বুঝি আগুনের ছটা?

ইস্পাতের কারখানায় 'ফার্নেশের' আগুন—

মনের এম্‌নি ভ্রম!

হটুকির হাট-তলা হইতে ও-আগুন সে কতদিন দেখিয়াছে!

ঠাণ্ডা বাতাস বয়—বুঝি বা প্রভাত হইয়া আসে।

দূরের অন্ধকার নিঃশব্দচরণে সরিয়া যায়—দিগন্তরাল হইতে অস্পষ্ট আলোর রেখা একটু একটু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। চারিদিক স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়া ওঠে।

অবিনাশ ভয়ে ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকে, তাকাইতে সাহস হয় না; ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী তাহার পায়ের নীচে ভীষণ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে—নিকটে কোথাও মাটির চিহ্ন আছে বলিয়া ত' মনে হয় না।

কিন্তু চোখ তাহাকে খুলিতেই হয়।

দেখে, পাথর দিয়া বাঁধানো নদীর উঁচু একটা পাড়ের কিনারায় প্রকাণ্ড একটা লোহার যন্ত্র বসানো; চালাটা তাহারই গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে। নিকটেই সারবন্দী গাছের আড়ালে প্রকাণ্ড একটা কারখানার বড় বড় কয়েকটা চিম্‌নীর মাথা দেখা যায়।

এ কোথায় চলিয়া আসিয়াছে অবিনাশ মনে মনে তাহাই ভাবিবার চেষ্টা করিল।

মিহির-পুরের কাগজের কল বোধ হয়। আর এই লোহার যন্ত্র দিয়া কারখানায় বোধকরি জল যায়।

কিন্তু আর বেশি ভাবিবার অবসর ছিল না। তাহার সেই ভাসমান আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া দিয়া সে কোনরকমে যন্ত্রটার উপর গিয়া উঠিল। পাড়ে উঠিবার চমৎকার উপায়!

নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া অবিনাশ নদীর দিকে একবার তাকাইল, কিন্তু গর্জ্জমান বিক্ষুব্ধ নদীর সে উচ্ছ্বসিত ভীষণ স্রোতের দিকে তাকাইতে ভয় হয়। ইহারই উপর কেমন করিয়া কি উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় রাত্রিটা যে তাহার পার হইয়া গেছে কে জানে! অবিনাশ তাহার সেই পরিত্যক্ত সামান্য আশ্রয়টির দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দেখিল, তাহারই এক পাশে সুন্দর একটি মেয়ে নির্জ্জীবের মত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে,—হাতে সোনার চুড়ি, পায়ে আল্‌তা,—ভদ্রঘরের বধূ বলিয়াই মনে হয়। চুড়ির শব্দ তাহা হইলে সে মিথ্যা শোনে নাই! কিন্তু কেমন করিয়া একই সঙ্গে তাহারা ভাসিয়া আসিল কে জানে!

অবিনাশ সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উঠিয়া আসিতেছিল। আর একবার সে এই মেয়েটির দিকে ফিরিয়া তাকাইল। উঠাইবে না কি?

না,—মরুক্!

কিন্তু পাড়ে উঠিয়া অবিনাশ আবার ফিরিল। আবার সেই লোহার ডাণ্ডা ধরিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু কি বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিবে? তুলিবে, কি তুলিবে না—এই প্রশ্নই বারে বারে তাহার মনে হইতেছিল।

অথচ আর অপেক্ষাও করা চলে না।

আর যেন সে হাতে পায়ে জোর পাইতেছিল না।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ তাহার ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। স্রোতের ধাক্কায় চালাটা আবার কাঁপিতে সুরু করিয়াছে। কি জানি হয়ত আবার ভাসিয়া যাইতেও পারে।

অবিনাশ ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া মেয়েটির প্রসারিত হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া তাহাকে একবার টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল মাত্র, মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

মেয়েটি আচম্‌কা মুখ তুলিয়া চাহিল—মনে হইল সে যেন তখনও হাঁপাইতেছে।

আর কাহারও কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। অনেক কষ্টে ধরাধরি করিয়া অবিনাশ তাহাকে টানিয়া তুলিল।

কিন্তু উপরের পাড়ে আসিয়াও মেয়েটি কথা কয় না; অসংবৃত গাত্রাবরণ সাম্‌লাইয়া লইয়া চুপ করিয়া হেঁটমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অবিনাশ কি কথা যে তাহাকে বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বলিল, "কোথায় ঘর তোমার ?"

মেয়েটি আড়-চোখে সলজ্জভাবে অবিনাশের মুখের পানে একবার তাকাইল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া আবার যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেম্‌নি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

এ হাসি অবিনাশের ভাল লাগিল না। আসন্ন মরণের হাত হইতে এইমাত্র বাঁচিয়া উঠিয়া কেহ যে এমন নির্লজ্জের মত হাসিতে পারে সে কথা তাহার জানা ছিল না।

অবিনাশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা ঘর মা তোমার ?"

মেয়েটি তবুও নিরুত্তর! চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটে!

এ আবার কেমন লজ্জা!

অনেক চেষ্টা করিয়াও অবিনাশ তাহাকে কথা কহাইতে পারিল না। ভাবিল, মেয়েটা বুঝি বোবা!

তা হোক্!

"তবে আয় আমার সঙ্গে!"

অবিনাশ আগাইয়া চলিল।

মেয়েটি তাহার পিছন্ ধরিল।

ক্রমশঃ—

প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

চোখ দুটা তার গোল আর লাল; আড়ে দীঘে সে প্রকাণ্ড; কিন্তু আকার আর চেহারার চেয়ে ভয়ঙ্কর তার কথা।

সহু খাঁ কথা কয় খুব আস্তে আস্তে, চাপা গলায়; তার কথায় আর চেহারায় এম্‌নি গরমিল যে তাহা শুনিলেই ধাঁ করিয়া মনে হয়,—আগুন ধোঁয়াইতেছে।

বাস্তবিক কথাগুলা তার ধোঁয়ার মতই—যেন হালকা; কিন্তু ভিতর হইতে কখন আগুনের জিব বাহির হইয়া আসে তাহার দিশা না পাইয়া লোকে তার সামনে একেবারে কুঁচ্‌কিয়া যায়। যে কয়জন পেয়ারের মানুষ তার আছে, সহুর লোক বলিয়া তাহাদের দাপটও কম নয়, অথচ তাহারাই আবার তার সামনে শীতের ব্যাঙের মত গুটাইয়া থাকে।......

সহু খাঁ আগে গাঁওয়াল করিত—

মানে, কোমরের ঘুন্‌সী, তামার তাবিজ, সুতোর

গুলি, সুঁচ, টিনের আয়না, চিরুণী, কাঠের কৌট খেলনা —এই সব মনিহারী জিনিষ মাথায় করিয়া গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করিয়া বেড়াইত।......

তারপর সে সুরু করিল ফড়ের কাজ—

পাট, তিসি, সর্ষে, রাই, ধান, ধনে, গম, তিল, কলাই,—এইসব যখনকার যা ফসল, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া তাই দশ বিশ সের সংগ্রহ করিয়া আড়তে আনিয়া দিত।......

তারপর হইল সে ব্যাপারী—

মানে, মহাজনের নৌকা পাট কি ধান বোঝাই হইয়া যায় মোকামে, সহু খাঁ সেই নৌকার আর মালের ভার লইয়া কর্ত্তা হইয়া সেই নৌকায় যাওয়া আসা করে।......

অতঃপর হাজার-মণে' এক পালোয়ারী নৌকা কিনিয়া সে নিজেই মহাজন হইয়া গদিতে বসিল।......

গাঁয়ে নিধিরাম দত্তর ঘরে সেদিন আগুন লাগিল।

এম্‌নি প্রায়ই হয়।

ছোট-খাটর মধ্যে এ-ও একটা ব্যবসা।

দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়া চালের উপর ফেলিয়া দিলে, আগুন লাগুক আর নাই লাগুক,—তার দাম এক টাকা।

খড়ের ভিতর জ্বলন্ত টিকে গুঁজিয়া দিলে—তিন টাকা।

ঘরের চার কোণেই আগুন দিলে—পাঁচ টাকা।

ঘরের ভিতরকার মানুষ বাহির হইতে না পারে, এম্‌নি করিয়া দরজা বাহির হইতে বন্ধছন্দ করিয়া আগুন দিলে—দশ টাকা।

সহু খাঁ ছিল এই-সবের সর্দ্দার। অবশ্য প্রচ্ছন্ন।

পয়মন্ত লোক, দেখিতে দেখিতে পড়্‌তা ফিরিয়া গেল। অনর্গল পয়সা হাতে আসিতে লাগিল।

কিন্তু লোকটার বজ্জাতি গেল না, বরং আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।

এখন সে হাটে যায়, বাজারের সেরা মাছটার চোয়াল ধরিয়া তুলিয়া অনর্থক জিজ্ঞাসা করে,—কত?

জেলে বলে,—আড়াই টাকা।

সহু বলে,—আড়াই টাকা? বেশ সস্তা ত! বলিয়া চাকরের হাতে মাছটা দেয়।

......বিদেশী যদি কেহ সেখানে থাকে, সে ভাবে, বুঝি সত্যই সস্তা সহুর কাছে; কিন্তু যে সহুকে চেনে সে মনে মনে হাসে; জেলে কাঁপিয়া ওঠে।......

সহু যাবার বেলা আটগণ্ডা পয়সা জেলের চুপ্‌ড়ীর ভিতর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়; যথালাভ মনে করিয়া জেলে তা-ই ট্যাঁকে রাখে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই মস্ত ব্যবসাত্‌ বলিয়া চারিদিকে নাম পড়িয়া গেছে।

নৌকা হইয়াছে তিন খানা। ওদিকে ঢাকা, ওদিকে রাজমহল, ওদিকে কল্‌কাতা পর্য্যন্ত তার মাল খরিদবিক্রী হয়।

দোতালা দালানও উঠিয়াছে, বিশটা কুঠুরী তার। বৈঠকখানা, ফরাস্‌, তাকিয়া, গড়্‌গড়া, ফুর্সী, অম্বুরী তামাক, পিতলের বদ্‌না,—সবই হইয়াছে। দাসী বাঁদী খান্‌সামা,—তাও দশ বিশটার কম নয়। বিবিও জুটিয়াছে—গোটা পাঁচেক—সোয়া গণ্ডা।

বিবিদের মহাল সব আলাদা আলাদা। এক এক বিবির খাসে দুই দুই বাঁদী।

দাসী বাঁদী বিবি—সকলের গর্ভেই ছেলে মেয়ে জন্মাইতেছে।...· তিনচার বছরেই সহু খাঁর অত বড় বাড়ী যেন জংলা পায়রার আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরাইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই সান্ত্বনার চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল নামিয়া আসিল।......

গাড়ী আসিয়া যখন বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল তখনও সান্ত্বনার চোখের জল নিবারিত হয় নাই।

এই তাহাদের প্রথম কলহ।—

সান্ত্বনা নীরবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শুইতে গেল। নীহার শয্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিল......

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যাপারটা পুনর্ব্বার আগাগোড়া চিন্তা করিতে যাইয়া এতক্ষণ যাহা তুচ্ছ কারণে সান্ত্বনার বাড়াবাড়ি দুঃখ বলিয়া নীহারের মনে হইতেছিল হঠাৎ তাহা আর তুচ্ছ রহিল না।—

সত্যই ত' সে অপরাধী।......

সকল দুঃখ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্ত্রীকে আত্ম-সম্মান রক্ষায় সহায়তা করা ত' তাহার কর্ত্তব্য।—সে তাহা করে নাই; উপরন্তু, অপমান কেন সান্ত্বনা অকাতরে নিঃশব্দে সহ্য করে নাই এই নিতান্ত অন্যায় আবদার করিয়া তাহাকে সে কঠিন গর্হিত বিদ্রূপ ও ভৎর্সনায় বিঁধিয়াছে!......

শিয়রে বাতি ছিল, সেটা জ্বালিয়া নীহার দেখিল সান্ত্বনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।......তাহার নিষ্কম্প মধুর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীহারের অন্তর অনুশোচনায় পুড়িতে লাগিল।......অথচ কায় মন ও বাক্য দিয়া যে তাহাকে এমনি করিয়া একান্তভাবে অবলম্বন করিয়াছে, কায় মন ও বাক্য দ্বারা তাহার সেই পবিত্র আত্মসমর্পণের মর্য্যাদা ত' সে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে নাই।......

নীহারের লোভ হইল, সান্ত্বনাকে জাগাইয়া ক্ষমা চায়।

কিন্তু সান্ত্বনার ক্লান্ত অবসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সে নিবৃত্ত হইল।......অপূর্ব্ব মমতার সহিত অতিশয় সন্তর্পণে সান্ত্বনার পাণ্ডুর গণ্ডস্থলে অশ্রুচিহ্নের উপর নিবিড় একটি চুম্বন রাখিয়া নীহার বাতি নিবাইয়া দিল।—সান্ত্বনা ঘুমের ঘোরেই একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল।

নীহার ভাবিতে লাগিল,—এত নিরুপায়, অসহায়, ভীরু, দুর্ব্বল, পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী ভগবান ইহাদের কেন করিয়াছেন?......করুণায় তাহার সারা প্রাণ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

* * *

ঘুমাইয়া পড়িবার কতক্ষণ পরে তাহার ঠিক নাই—বোধ হয় দু'চার মিনিট্ পরেই, নীহারের ঘুমের ঘোরেই মনে হইল, ঘরের ভিতর কে যেন আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মগ্ন চেতনায় এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, যে আসিয়াছে সে শত্রু।......চতুর্দ্দিকে অফুরন্ত অটল জমাট্ অন্ধকার......ঘূর্ণীবায়ু সঞ্চালিত বালির স্তম্ভের মত অন্ধকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাষাণের মত নিরেট্ হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল......নিঃশ্বাস কষ্টকর এবং বোধশক্তি অসাড় হইয়া গেল।......

অল্পে অল্পে তার বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি সতেজ হইয়া উঠিতে লাগিল—প্রাণ বিপন্ন।......দুঃসহ ত্রাসে তাহার মননশক্তি বিকল হইয়া মস্তিষ্ক জুড়িয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু প্রবলতম চেষ্টা সত্বেও হাত পা নড়িতে চাহিল না।......হিংস্র শত্রুকে তাড়াইতে হইবে—শত্রু মুখের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, তার মুখে তীক্ষ্ণ ক্রুর হাসি, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্বক্ ভেদ করিতেছে......মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া হঠাৎ একটা প্রাণপণ অমানুষিক উদ্যমের ফলে অতল অসাড়তা ভাঙ্গিয়া নীহারের হাত দুখানা ছুটিয়া আসিয়া শত্রুর টুঁটি চাপিয়া ধরিল।......একটা তীক্ষ্ণ স্বল্পজীবী আর্ত্তনাদ তাহার অজ্ঞানের কঠিনতম তমিস্রা যেন ভেদ করিল......কি

একটা পদার্থ তার মুখের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াই উঠিয়া গেল।…সেই শব্দে ও আঘাতে তাহার নিদ্রা তরল হইয়া দুই বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর শক্তি সঞ্চারিত হইল।—

শত্রু যে সান্ত্বনাকেও আক্রমণ করিয়াছে……

আর্ত্তস্বর তারই……

সেই ছট্‌ফট্ করিতেছে……

ক্রোধক্ষিপ্ত নীহারের অঙ্গুলিগুলি লৌহশলাকার মত পরাস্ত শত্রুর কণ্ঠের মাংসের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া গেল……

কিছুক্ষণ আঙুল চাপিয়া রাখিয়া দুইবার ঝাঁকি দিয়া নীহার তাহাকে ছাড়িয়া দিল।—

শত্রুর আর্ত্তনাদে এবং মুখের উপর অদৃশ্য পদার্থের আঘাতে নীহারের নিদ্রা তরল হইয়া চৈতন্য ফিরিতে-ছিল।—

নিদ্রা যখন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিল তখন সে অন্ধকার শূন্যের মধ্যে নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া হাঁপাইতেছে।…… কক্ষ শব্দশূন্য নিস্তব্ধ—

তাহার নিজেরই পরিশ্রান্ত নিঃশ্বাসের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নাই।…………

দুঃস্বপ্ন আবার আসিয়াছিল ?——

মনে পড়িতেই নীহার আপনমনে একটু সকৌতুক ক্ষীণ হাসি হাসিল।………

এই দুঃস্বপ্নকে ভিত্তি করিয়া কতবড় একটা কলহই না ঘটিয়া গেছে!………সান্ত্বনা ত তাহাকে সাবধান করিয়াই দিয়াছিল! বিনা অপরাধে কল্যাণপ্রার্থিনীকে কত অপ্রীতিকর নিকরুণ কথাই না সে শুনাইয়াছে! ………সকাল বেলা যখন কলহের স্মৃতি থাকিবে না তখন সান্ত্বনা এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া ভয় পাইয়া কত কীর্ত্তিই না করিবে!……

—সান্ত্বনা ?—

প্রত্যুত্তর আসিল না।

সান্ত্বনার ঘুম ভাঙ্গে নাই; কিন্তু মনে পড়ে যেন সে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও একবার চীৎকার করিয়াছিল। অভিমান এখনো ভাঙ্গে নাই, কথা কহিবে না ?—

নীহার পাশ ফিরিয়া সান্ত্বনাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল,—"সান্ত্বনা আমায় ক্ষমা কর"—আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই বাকি কথাগুলি তার কম্পিত ওষ্ঠাধরের উপর জমিয়া উঠিয়া নিশ্চল হইয়া গেল………

উচ্চারিত হইল না।—

………সান্ত্বনার দেহের স্পর্শ উষ্ণ তবু কেন নির্জ্জীব ?………

একটা অচিন্তনীয় ভয়ঙ্কর সন্দেহে শিহরিয়া উঠিয়া যে-ভয় অকস্মাৎ তাহাকে পাইয়া বসিল তাহা সেই দুঃস্বপ্নের শত্রুভীতির চেয়ে বহুগুণে প্রবল।………… অন্ধকারের মধ্যে অতি তীব্র আকস্মিক ত্রাসে নীহারের বুক হিম হইয়া স্পন্দন অসহ্য দ্রুত হইয়া উঠিল।—তাড়াতাড়ি দিয়াশলাইটি হাতে করিয়া কাঠি বাহির করিতে তাহার বহু বিলম্ব হইয়া গেল—হাত এমনি কাঁপিতেছিল!………

বাতি জ্বালিয়া সান্ত্বনার দিকে চাহিয়াই সীমাহীন দুরন্ত আতঙ্কে নীহারের হৃদয় ও মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া চোখের দৃষ্টি কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতে পারিল না।………

সান্ত্বনা স্থির হইয়া শুইয়া আছে—

কিন্তু ঐ কোটর-ছাড়া পলকহীন ভয়ঙ্কর চক্ষুতারকা ত' সান্ত্বনার নয়………

আর তার কণ্ঠের উপর দশটি অঙ্গুলির নিষ্পীড়নের ঐ চিহ্ন!………

নীহারেরও চক্ষু আরও বিস্তৃত ও পলকহীন হইয়া সেই রক্তবর্ণ দশটি চিহ্নের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। দেহের শক্তি কণ্ঠের শব্দ নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া সে যেন একটা স্পন্দহীন মূর্ত্তির মত কেবলি শূন্যে দোল খাইতে লাগিল!………

স্নায়ুর ও মনের এই নিরালম্ব দৌর্ব্বল্য তাহাকে বেশীক্ষণ সহ্য করিতে হইল না—

জ্ঞান হারাইয়া সে মৃতদেহের পাশেই লুটাইয়া পড়িল।...

যখন ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইতে লাগিল তখন মানসিক যন্ত্রণা লঘু হইয়া গেছে।—

মনে হইল—পুনর্ব্বার সে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে।.........

এমন অবিশ্বাস্য স্বপ্নাতীত ঘটনা ঘটিতেই পারে না।.........

অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া সে নূতন করিয়া চমকিয়া উঠিল—

বাতির আলো সান্ত্বনার নিস্পন্দ দেহের উপর নাচিতেছে—

শুভ্র গৌর কণ্ঠের উপর রক্তবর্ণ চিহ্নগুলি মিথ্যা হইয়া যায় নাই.........

সেইদিকেই চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নীহার সহসা মৃতদেহ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল—

অতি সাবধানে সান্ত্বনার বাঁ হাতখানা মুষ্টির মধ্যে তুলিয়া লইল.........কান পাতিয়া রহিল, যেন নাড়ী চলার শব্দ হইবে.........শব্দ নাই, কিন্তু নাড়ী বুঝি চলিতেছে—

হঠাৎ সান্ত্বনার বুকের উপর কান দিয়া কাত্ হইয়া পড়িল.........

বুক বুঝি ধুক্ ধুক্ করিতেছে.........

না, না,—

রক্তের গতি একেবারে থামিয়া গেছে—

জীবনের ক্ষীণতম কম্পনও কোথাও অবশিষ্ট নাই। দশটি আঙুলের চাপ দিয়া প্রাণের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত সে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।.........

সহসা একটা নিঃশব্দ বীভৎস হাস্যভঙ্গীতে নীহারের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।...

একি অভিনয়.........একি তামাসা!

যে ভোজন-ব্যাপারের এই পরিণতি সে ত তখনকার কথা; রায়ের পাশবিক আচরণ, সান্ত্বনার সঙ্গে কলহ—

সান্ত্বনার সঙ্গে কলহ!.........

নীহার সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সান্ত্বনার সঙ্গে কলহের মত হাসির কথা আর কিছু নাই............ পাগলের হাসির মত অর্থহীন এই হাসি যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেম্‌নি অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল।.........

নীহার শয্যা হইতে নামিল—

টলিতে টলিতে যাইয়া দরজা জানালা সবগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিল——

শয্যার পার্শ্বে আসিয়া হেঁট হইয়া সান্ত্বনার চোখের পাতাদুটি পরস্পর মিলাইয়া দিল।.........

বাতি জ্বলিতেই লাগিল——

নীহার শয্যায় উঠিয়া সান্ত্বনার দেহের পার্শ্বে শয়ন করিল——

দেহটি দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখখানা বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল.........

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভুলিয়া শুষ্কচক্ষে শুধু সে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল......... *

---

* ইংরাজী হইতে

প্রার্থনা

হাফেজ

চাঁদের মত সুন্দর তোমার মুখ—দুনিয়ার যত কিছু সৌন্দর্য্য তোমারই দেহে! তোমাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণ যে যায়! প্রাণ কি সত্যই যাবে না আবার ফিরে আসবে?—তোমার কি আদেশ?

ভাগ্য আমার ঘুমিয়েছিল,—কিন্তু তোমার জ্যোতির্ম্ময় মুখের ছটায় চোখে আমার জল এসেছে—এবার বুঝিবা সে জাগে!

চিত্ত আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে বন্ধু! আমার মাথার দিব্যি,—চিত্তহারীকে সংবাদ দাও!

বসন্তের হাওয়া যখন বইবে বন্ধু, তোমার উদ্যান থেকে ফুলের দুটো ছেঁড়া পাপ্‌ড়িও অন্তত পাঠিও! আর কিছু না পাই তোমার উদ্যান-ধূলির সৌরভ ত' পাব।

সাবধান বন্ধু, অনেক জীবনের উৎসর্গ হয়ে গেছে এই পথের ওপর—তোমারই উদ্দেশে! আমার কাছে যখন আসবে, আঁচল সাম্‌লে এসো—নইলে বলির রক্তে বস্ত্রাঞ্চল তোমার রাঙা হয়ে উঠবে।

ভগবানের দোহাই, হে রাজাধিরাজ! আমায় একটুখানি উচ্চ অভিলাষ দাও! তোমার গগনস্পর্শী বিরাট প্রাসাদের পদপ্রান্ত চুম্বন করে' আসি।

হাফেজ প্রার্থনা করছে, শোনো শোনো, স্বস্তিবচন বল! তোমার মুখনিসৃত অমৃতধারায় আমার জীবনের একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাক্‌!

মাটির ঢেলা

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ্ দিলে কে তোর গায়ে ?
গড়্‌লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে ?
ভুখ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে ?
কোন্ খেয়ালির খেলেনা তুই হায়রে !
কোলের পরে দুলিস্ কভু
মাটির পরে যাস্ পড়ে—
মলিন ধূলা লাগে সকল গায় রে !

আঘাত খেলে বুক ফাটে তোর
চোখের জলে যায় গলে,
চোট্ খেয়ে তুই লুটিয়ে পড়িস্ ভুঁয়ে।
কান্না হাসির দোলা লাগে,
রঙ যা কিছু যায় চটে,
বর্ষাধারায় যায় রে সে যায় ধুয়ে।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ডাক্‌ছে তোরে তোর মাটি,
টান্‌ছে আপন স্নেহ-শীতল কোলে।
ঢেউএর পরে জীবন-ভেলা
এমন সেথা ভুল্‌বে না,
ভিড়্‌বে নাক ভীড়ের হট্টগোলে।

ব্যাঘাত নাহি আঘাত নাহি,
খাম্‌খেয়ালির নেই খেলা,
নেইক মরণ-ভয়ের ভীষণ ভুর্‌কুটি।
বৃষ্টি-পরশ সরস-দেহে
জাগ্‌বে তৃণ হয়ত রে,
একটি ছোট উঠ্‌বে কুসুম ফুটি।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুল্‌লে তোর চল্‌বেনা,
তুই যে মাটি চিরকালের মাটি।
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদিবা রঙ যায় লেগে,
মাটি রে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

———

বিচিত্রা

এবার আইরিশ সাহিত্যিক জর্জ বার্ণার্ড শ
াহিত্যের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। বিগত
ঃ বৎসরের মধ্যে তিনি নাটক, উপন্যাস, সমা-
লাচনা ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ রচনা
রা বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তাক্ষেত্রে
শিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডবলিন নগরে তাঁহার জন্ম।
৫ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িয়া
বিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আয়ার্লণ্ডে
বৎসর চাকরী করিয়া ১৮৭৬ সালে তিনি
পরিবারে লণ্ডনে আসিয়া টেলিফোন কোম্পানীর
াফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময়েই
নি উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন।

তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুইখানি শ্রীমতী
নিবেসান্ত সম্পাদিত "Our Corner" পত্রিকায়
ং তৃতীয়খানি "To-day" নামক সোশিয়ালিষ্ট
ত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি
বিয়ান সোসাইটি নামক বিখ্যাত সোশিয়ালিষ্ট
লের সভ্য হন এবং উদ্যমের সহিত বক্তৃতা ও
বন্ধাদির দ্বারা সোশিয়ালিষ্ট মত প্রচারে প্রবৃত্ত
। এই সময়ে তিনি কেরাণীগিরি ছাড়িয়া
য়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন
রিতে লাগেন। যথাক্রমে পেলমেল গেজেট,
র, ওয়ার্ল্ড এবং স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকায়
নি নিয়মিতভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং
াদির সমালোচনা লিখিতেন।

১৮৯১ সালে "ইবসেনিয়ানার সারতত্ত্ব' নামক
গ্রন্থে নরওয়ের জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার ইবসেনের
নাটকগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি
ইংরেজ পাঠকের চিন্তাস্রোত এক নূতন দিকে
প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও
নাটকের পর নাটক রচনা করিয়া সাহিত্য ও
চিন্তাজগতে আলোড়ন উপস্থিত করিলেন।

মধ্য ভিক্টোরিয় যুগে ব্রিটিশ সমাজ বাণিজ্য-
সম্পদ্‌ ও সাম্রাজ্য গৌরবের মোহে আচ্ছন্ন
হইয়া যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল উনবিংশ
শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহা অটুট থাকিল
না। কলকারখানার ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে
সঙ্গে নূতন নূতন সামাজিক সমস্যা ও সংঘর্ষের
উদ্ভব হইতে লাগিল। মহাজন ও শ্রমিক, ধনী ও
দরিদ্রের সংঘর্ষ হইতেই সোশিয়ালিষ্ট মতের
উদ্ভব।

ইংরেজী সাহিত্যে যে সমস্ত প্রতিভাবান্‌ লেখক
এই নবীন চিন্তাপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন
তন্মধ্যে বার্ণার্ড শ-এর রচনা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক।
তাঁহার বিদ্রুপাত্মক নাটকগুলির জন্য অনেকে
তাঁহাকে ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েরের সহিত তুলনা
করেন। তাঁহার বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাণে সমাজের মধ্যে
যত কিছু ভণ্ডামি, কপটতা, মিথ্যা জাঁক ও ফাঁকা
আওয়াজ ধর্ম্ম, নীতি ও ভদ্রতার নাম লইয়া জাঁকিয়া
বসিয়া আছে, সমস্তই ছিন্ন ফানুসের মত ফাঁসিয়া
যায়।

তিনি একদিকে যেমন নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক, অন্যদিকে নাট্যশিল্পের রচনাপদ্ধতিতেও পথ প্রদর্শক। যে সমস্ত নাট্যকারের চেষ্টায় ইংলণ্ডের নাট্যশিল্প আধুনিক যুগে বাস্তবতা ও নবজীবন লাভ করিয়াছে বার্ণার্ড-শ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার প্রধান কয়টি নাটকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Mrs. Warren's Profession; Arms and the Man; Candida; Captain Brassbounds' Conversion'; The Doctor's Dilemma; John Bull's Other Island; Man and the Superman; The Philanderer.

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দিকে দিকে আবার সেই স্বরাজ্য দলেরই জয়?

দেশের ও দশের যে ইহাতে কত বড় ক্ষতি, তাহা আজও লোকে ভাল করিয়া বুঝিল না?

অথচ বুঝাইবার কত চেষ্টাই না হইল! কত যুক্তি, কত অর্থ, কত ফন্দী, কত ফিকির, কত কুৎসা, কত কালি, —কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না?

মেকীর দলই জিতিয়া গেল? বীর-রসের অভিনয়ই বাহবা পাইল?

রেস্পন্সিভিষ্ট্ দলের অক্ষয় কবচ-পরা বীরবৃন্দের মনে মনে লড়াইয়ের কত সূক্ষ্ম কৌশল ও বিচিত্র কসরৎ সঞ্চিত ছিল, কত হিসাব করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া সেগুলি প্রয়োগ করা হইত, তাহা অর্ব্বাচীন নির্ব্বাচক-মণ্ডলী একবার ভাবিয়াও দেখিল না?

* * *

কিন্তু অনর্থ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে—

এখন উপায় কি?

দেশের লোকে একথা না ভাবুক, ভাবিবার দা যাঁহাদের, তাঁহারা ভাবিবেনই—এবং ভাবিতেছেনও।

... ...

স্বরাজীরা ত ডায়ার্কি ভাঙ্গিতে পারিল না! এবারো পারিবে না—

কাউন্সিলে এবারে উহারা আরও পঙ্গু হইয়া রহিবে-

বোকার দল যদি মন্ত্রীত্ব লইত! বা অপর কাহাক লইবার সহায়তা করিত!

সে সু-বুদ্ধি যখন উহাদের হইবেই না, তখন কাউন্সি যাহাতে চলে, মন্ত্রী-পরিষৎ যাহাতে গড়ে, তাহার ব্যব করিতেই হইবে।

আর যদি একান্তই সে-সুবিধা না হয়, তখন অগত্যা ঐ গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই কখনও এদিক কখনও ওদি করিব।

এ ছাড়া আর কি করিতে পারি?

* * *

বাস্তবিক, এ-ছাড়া আর কিছুই করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই।

ঐ গণ্ডীর বাহিরে তাঁহাদের দৃষ্টি ত আর এতটুকু চলে না!

দেশের গণ-শক্তির উপর তাঁহাদের এতটুকু আস্থা নাই!

শ্রদ্ধাই নাই ত আস্থা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই বার বার হিসাব কষিতে গিয়া মাথা গুলাই যায়—

ঐ অতগুলি সরকারি সভ্য......ঐ অতগুলি মনোনী সভ্য......ঐ অতগুলি মুসলমান সদস্য... ..ঐ উঠি বসিতে চলিতে ফিরিতে নানান্ দিক্ দিয়া নানান্ আই সম্মত বাধা......

দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

* * *

তাকাইয়া কোকলা-দাঁতে খিলখিল্ করিয়া হাসে ; একটু-খানি দূরে সরিয়া গিয়া বলে, "কেমন হচ্ছে ? একাই সব। খড়ের কুটোটি কেউ এদিক-ওদিক করে দেয়নি বাবা—হেঁ হেঁ......

এক-মৃত্তিকা শেষ হয়, মাটির 'বনকে' ন্যাকড়া ভিজাইয়া দু-মৃত্তিকার পালিশ চলে।

পনর-ষোল বছরের ছেলে চরণ মাথায় টেরি কাটিয়া কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া ও-পাড়ার তাঁতি-ঘরে তামাক খাইতে যায় ; পথে একবার কার্ত্তিক-কুঠুরির দরজায় দাঁড়াইয়া বলে, "বাবা, খেতে যাও, মা ডাকছে।"

বলিয়াই আবার চলিবার উপক্রম করে।

মুখ না তুলিয়াই বিপিন ডাকে, "শোন্ শোন্!"

"কি বলছ কি ?" বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও চরণ ফিরিয়া দাঁড়ায়।

ছোট একটা সাপের বাচ্চা গড়িতে গড়িতে বিপিন বলে, "শোন্, আয় উঠে আয়।"

চরণের দেরী আর সহ্য হয় না, উঠিয়া আসিয়া বলে, "কি বলছ বল ঝপ্ করে'।"

সাপের বাচ্চাটি ময়ূরের দুটি ঠোঁটের ফাঁকে ধরাইয়া দিয়া বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়া ফিরিয়া বারকতক্ প্রথমে বেশ ভাল করিয়া দেখে, তাহার পর বলে, "আচ্ছা বল্ত' দেখি চরা, রথিৎপুরের ময়ূরটাও ত দেখেছিস—সেই যে এঁকে দিয়েছি তোর মামার বাড়ীর বৈঠকখানার দেয়ালে,—আর এটাও ত দেখছিস—কোন্টা ভাল হয়েছে বল্ দেখি ঠিক করে' ?—ঠিক্ বলবি, ঠি—ক্ একেবারে কাঁটায় কাঁটায়......।"

চরণের মুখের পানে বিপিন তাহার-চশমা পরা চোখ দুইটি তুলিয়া সাগ্রহে তাকাইয়া রহিল।

চরণ ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "সেইটে—রথিৎপুরের সেইটে—।"

চশমার ভিতর বিপিনের চোখ দুইটা হঠাৎ অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিল।

"যা যা যা তবে সেখানেই দেখ্‌গে যা—রথিৎপুরেই যা—ভাগ্!"

চরণের ঘাড়ে ধরিয়া বিপিন তাহাকে এমন ঠেলিয়া দিল যে সে একেবারে রাস্তায়।

আইবুড়ো মেয়েটা তখন ভাঙা কাঁশি হইতে ভাতের ঢেলাগুলা ছুড়িয়া ছুড়িয়া মুখে পুরিতেছিল, চোখ হইতে চশমাটা খুলিয়া বিপিন সেইখানে গিয়া তামাক টানিতে বসিল।

"কি তরকারী ? পুষ্পু!"

পুষ্প সোহাগে গদ-গদ হইয়া নাকি সুরে বলিল, "ছাঁই—পুঁস্ত ভাঁজা আর টঁক্..."

বিপিন বলিল, "দেখেছিস ঠাকুর আমাদের ? কার্ত্তিক ?...ময়ূরে-চড়া কার্ত্তিক এ-বছর!—"

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পুষ্পর মা হঠাৎ কোথা হইতে একেবারে রণচণ্ডীর মত আসিয়া হাজির হইল।

"রাখো রাখো তোমার হুঁকো রাখো! ক' লাখ টাকা পাবে যে ঠাকুর গড়্‌ছ দিন রাত ? ঘরে যে কাল থেকে' উনোন্ জ্বলবে না তার ঠিক রাখ ?"

বিপিন উবু হইয়া বসিয়াছিল, হুঁকাটা মুখের কাছ হইতে একটু খানি সরাইয়া লইয়া পুষ্পর মায়ের দিকে তাকাইয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল,—"দেখেছিস্ ? দেখেছিস্ ঠাকুর কেমন গড়েছি ?"

"আঃ মর্!" বলিয়া পুষ্পর মাও হাসিয়া ফেলিল। "এমন মানুষ ত কখনও দেখিনি মা! নাও—ওঠ, চান্ কর—করে' যাহোক্ চারটি পিণ্ডি গেলো,—গিলে যাও কোথা যাবে যাও—বেরোও তুমি ঘর থেকে!"

এতক্ষণ পরে পুষ্প একটা ভাতের ঢেলা কোঁৎ করিয়া গিলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "ঠাকুর এখনও রাঙানো হয়নি বাবা— ?"

মুখখানা অত্যন্ত কদাকার করিয়া বিপিন বলিয়া উঠিল, "এঁঃ! এতক্ষণে রাঙানো হয়নি বাবা—? কেন দেখে আসতে পারিস্ না? ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোখ দুটো দিয়ে দেখে আসতে পারিস্ না?"

পুষ্প আর কিছু না বলিয়া হেঁট মুখে আবার ভাত খুঁটিতে লাগিল।

"ও কি খাওয়া লো তোর? ও কি খাওয়ার ছিরি?"

বলিয়া মা তাহার পিঠে একটা লাথি মারিয়া ভিজে গামছাটা বিপিনের কাঁধের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "যত নষ্টের গোঁড়া এই তুমি! আদর দিয়ে মেয়ের মাথাটি খেলে ত? নাকে কথা কইছে—আঃ মর্!"

হুঁকাটা এইবার হাত হইতে নামাইয়া বিপিন স্নান করিতে গেল।

ঠাকুরের গায়ে রং চলিতেছিল।

টানাটানা এক জোড়া ভুরু হইল, চোখের পাতা চোখের তারা—সবই হইয়া গেল, বাকি রহিল শুধু এক জোড়া গোঁফ।

ময়ূরের চোখ দিয়া পেখমের রং ফলাইয়া বিপিন যখন কার্ত্তিকের গোঁফে হাত দিল—বেলা তখন প্রায় ডুবিয়া আসিয়াছে।

কার্ত্তিক-কুঠুরির দরজা হইতে বিপিন ডাকিল, "পুস্পু পুস্পু!"

ডাক শুনিয়া নাকি সুরে পুষ্পর জবাব আসিল,—"কি—!"

"খপ্ করে একটা পিদিম্ আন্ দেখি—পিদিম্!"

প্রদীপ যখন আসিল গোঁফ দুইটা বিপিন তখন প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

বাঁ হাতে প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া একাগ্রমনে বিপিন একবার পিছাইয়া একবার আগাইয়া নানান্ ভঙ্গীতে কার্ত্তিকের মুখখানি দেখিতে লাগিল।

কাছে লোকজনও কেহ নাই যে তাহাকে ডাকিয়া দেখায়!

দূরের গ্রাম হইতে শ্রাদ্ধশান্তি সারাইয়া ঈশান ঠাকুর বাড়ী ফিরিতেছিল—কাঁধের দুই পাশে গামছায় বাঁধা দুইটা পুঁটুলী, এক হাতে পাতায় জড়ানো কয়েকটি পুঁটি মাছ।

"কি হে, তামাক খাচ্ছ নাকি? ঠাকুর গড়া হচ্ছে? বেশ বেশ—!"

সাগ্রহে বিপিন তাহার বাঁ হাতের প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, "এসো এসো এসো, এসো দেখি, শোনো শোনো—"

ঈশান ঠাকুর রাস্তার উপরেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

"আচ্ছা, দেখ ত', দেখ ত' ঠাকুর—কার্ত্তিকের এই গোঁফ জোড়াটা দেখ ত' ওইখান থেকে ঠিক হলো কি না—"

ঈশান ঠাকুরের কাঁচা পাকা ভুরুর লোমে ও চোখের পাতায় জড়াজড়ি হইয়া গেছে। বয়স হইয়াছে কিন্তু তাহার চোখের জ্যোতি কমে নাই, গহ্বরের ভিতর মাণিকের মত কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দুইটা তাহার যেন অন্ধকারেও জল্ জল্ করে।

বার কতক ঘাড় বাঁকাইয়া কপাল কুঁচকাইয়া ঠাকুর বলিল,—গোঁফ্?—দেখো বাঁ দিকেরটা একটু ছোট হলো না—ডানদিকের চেয়ে?"

"ছোট? আচ্ছা দাঁড়াও।" কাদো কালির মোটা তুলিটা বিপিন তখনও হাতছাড়া করে নাই। কার্ত্তিকের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রদীপ ধরিয়া বাঁ দিকের গোঁফের উপর সে আর এক পোঁচ্ কালি বুলাইয়া দিল।

"এইবার?"

ঘাড় নাড়িয়া ঈশান ঠাকুর বলিল, "উঁহুক্! এবার যেন এই দিকেরটা ছোট হয়ে গেল!"

"আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও।"—বিপিন উল্টা দিকে আবার তুলি চালাইল।

ঈশান বলিল, "ও কি করলে? ওর চেয়ে আগেই ভাল ছিল।"

"না হে না—এই দেখ তুমি ঠিক করে দিচ্ছি !"

বিপিন তুলিটা ধীরে ধীরে আর একবার দুই দিকেই বুলাইয়া দিয়া প্রদীপটা সেই খানেই নামাইয়া রাখিয়া পিছু হাটিয়া বলিল,—"দেখ—ঠিক হয়ে গেছে—বাস্ !"

ঈশান এবারেও ঘাড় নাড়িয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। "তার চেয়ে তুমি কাল ঠিক করো—বুঝলে ? নাও, তামাক খাও দেখি একবার ! অন্ধকার হয়ে গেছে, আজ আর তুলি-টুলি ধরো না।"

বিপিন আবার কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া বসিল।

"হয়নি ঠিক ? বেশ ভাল করে' দেখ দেখি ?" মাটিতে নামান কাল কালির খোলার উপর হাতের তুলিটা নাড়িতে নাড়িতে বিপিন একবার কার্ত্তিকের মুখের পানে একবার ঈশান ঠাকুরের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল।

ঈশান ঠাকুর মাথার টিকি নাড়িয়া বলিল, "নাঃ সুবিধামতটি ঠিক হলো না এখনও বিপিন !"

"হলো না ?"

"নাঃ !"

ঝুন্ মারিয়া হেঁটমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বিপিন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হলো না তাহ'লে—কি বল ?"

ঈশান বলিল, "জ্বালাতন দেখছি ! ক'বার বলব ?"

"তবে এ-এ-এ—এই নাও ! হলো ?"

কালির কাটরা হইতে মোটা তুলিটা তুলিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে হা হা করিয়া নিষেধ করিতে না করিতে কার্ত্তিকের সারা মুখখানা তুলি চালাইয়া বিপিন একেবারে ভূতের মত কালি অন্ধকার করিয়া দিল।

"করলে কি ? করলে কি ?"

ঈশান ছুটিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, বিপিন সজোরে তার মুখের উপর কালি-সমেত তুলিটা ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "তোমার মাথা !"

থু থু করিয়া থুতু ফেলিয়া হাত দিয়া মুখের কালি ঘুচাইতে গিয়া ঈশান ঠাকুরের মুখখানাও কম কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া উঠিল না। বোকার মত হতভম্ব হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন আর মুখে কোনও কথা বলিল না, প্রদীপটা পায়ে করিয়া উল্টাইয়া দিয়া দরজার শিকলি তুলিয়া হন্ হন্ করিয়া আপনমনেই ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া দেখে তাহার অপরিসর উঠানের উপর তখন এক প্রলয় কাণ্ড বাধিয়াছে। দু'ভাই-বোনে ভীষণ ঝগড়া !

পুষ্পর খাটো চুলের মুঠি ধরিয়া চরণ তাহাকে চর্‌কির মত সারা উঠানময় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, আর পুষ্প চেঁচাইতেছে,—"দেঁখ্ মা দেঁখ্ ! গাল দেঁব এবারে— দেঁখ্..."

চরণ বলিতেছে, "তুই খেয়েছিস কিনা বল্ হারামজাদী শালী কোথাকার !"

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া দুজনার পিঠে গুমাগুম্ কিল বসাইয়া দিয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দিল।

চরণ তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতে দিতে ছুটিয়া পালাইল। পুষ্পর কান্না আর থামিতে চায় না।

"লঙ্কা খাঁই আমি কঁখনও ! গাঁছে তিনটি ঘুঁষিমুষি লঙ্কা ধঁরেছিল—নাই, তাঁ আমি কি জানি—!"

গিন্নি কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া যত দোষ বিপিনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলিল, "ওই ত' জানো ! দিলে ত কাঁদিয়ে ? এলেন এতক্ষণে ঠাকুর গড়ে ! কেন মোড়ল-পাড়ার দিকে একবার যেতে হতো না ? ঘরে একটি চাল নেই ত কি টোকা-পেছে হাতে নিয়ে দোরে-দোরে ভিক্ মেগে' বেড়াব আমি ?—না কি ? আ-মর্ ! এমন পুরুষ-বেটাছেলের মুয়ে ঝাঁটা !"

এম্‌নি আরও সব কত কি সে বলিতে বলিতে আপন-মনেই গর্জ্জাইতে লাগিল।

সুমুখে চালার এককোণে বাঁশের আন্‌লায় বিপিনের পোষাকী ছাতা চাদর জামা হরদম্ ঝুলিত। ছেঁড়া খাঁকির জামাটা সে তৎক্ষণাৎ গায়ে দিয়া আধ-ময়লা চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া লইল, ছাতিটা বগলদাবা করিয়া জুতার সন্ধানে

একবার এদিক-ওদিক তাকাইল; চটিজুতা একজোড়া তাহার ছিল, কিন্তু পুত্র চরণের কৃপায় সব সময় তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, খুঁজিতে গেলে দেরি হইবার সম্ভাবনা তাই সে খালি পায়েই ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মোড়ল-পাড়ায় যাইবার পোষাক ইহা নয়; গিন্নি বলিল, "ছাতা চাদর নিয়ে মরতে কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

কিন্তু কথায় তখন কে-ই বা জবাব দেয়! কে যেন কাহাকে বলিতেছে এম্‌নি অগ্রাহ্য করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে হন্ হন্ করিয়া বিপিন যে কোথায় চলিল কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

নিতান্ত ছোট শহরের সঙ্কীর্ণ পথে আলোর বালাই নাই। আসন্ন শীতের সন্ধ্যায় অপর্য্যাপ্ত ধূলা উড়াইয়া শহরের ফেরৎ মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীগুলি ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করে। গাড়ীর নীচে কেরোসিনের কুপি জ্বলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের ধূলা নজরে পড়ে না, কিন্তু পথযাত্রী পথিকের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

একসঙ্গে চারখানা গাড়ী পার হইতেছিল। পথ বন্ধ। চাদরের একটা খুঁট নাকে চাপিয়া ধরিয়া পথের এক পাশে বিপিন সরিয়া দাঁড়াইল।

পাশেই একটা বড় বাড়ীর দরজায় তখন সবেমাত্র একটা ঘোড়ার গাড়ী খোলা হইয়াছে। একপাশের একটা বাতি তখনও মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল—আর একটা বাতি লইয়া সহিস বোধ করি ঘোড়া দুইটা আস্তাবলে রাখিতে গেছে।

বিপিন দেখিল, বাড়ীর সদর দরজাটা খোলা। সুমুখেই বসিবার ঘর। মেঝের উপর ফরাস্ বিছাইয়া বাবু বসিয়া আছেন। লোকটা যেমন মোটা তেম্‌নি কদাকার।

"কি চাই?"

বিপিন বলিল, "আজ্ঞে এক গ্লাস জল!"

বাবু ডাকিলেন, "সদা! সদা!"

চাকর আসিল, জলও আসিল।

ঢক্ ঢক্ করিয়া জলের গ্লাসটা খাইয়া ফেলিয়া দেওয়ালের একপাশে ছাতিটি নামাইয়া রাখিয়া বিপিন মেঝের উপরেই উবু হইয়া বসিল। বলিল, "কল্‌কেটা একবার—"

বাবু বলিলেন, "তামাক খাবেন?...আপনি?"

"আমি ব্রাহ্মণ।"

ঘরের কোণে একটা হুঁকা দেখাইয়া দিয়া বাবু তাঁহার নিজের গড়গড়া হইতে কলিকাটা তুলিয়া মাটিতে নামাইয়া দিলেন।—"নিন্।"

বিপিন আপনমনেই অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক টানিল; তামাক টানিতে টানিতে কি যেন সে ভাবিতেছিল—কি যেন বলিবার জন্য অনেকক্ষণ হইতেই সে উসখুস্ করিতেছিল। মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ঘরের দেওয়াল এবং কড়িকাঠের দিকে বার কতক্ তাকাইয়া বিপিন বলিল, "আচ্ছা, এ ঘরে আপনি রং করেন না কেন? করলেই ত পারেন।"

বাবু জবাব না দিয়া কয়েকটা নথিপত্র উল্টাইতে লাগিলেন।

বিপিন বলিল, "রং আমি খুব ভালই করতে পারি! দেখুন, কল্‌মি লতের উপর এমনি গোলাপ ফুল আমি এঁকে দেব যে দেখে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—বুঝলেন?"

বাবু একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু বিপিন তখন কথা বন্ধ করিয়া আবার তামাক টানিতে সুরু করিয়াছে।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

হুঁকাটা বিপিন হাত হইতে নামাইয়া বলিল, "দেখুন—বাইরের ওই বারান্দায় আপনার লোকজন কেউ শোয় কি?"

মুখ না তুলিয়াই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"রাত্তিরে আর কোথায়...তাই বলি—এইখানেই একটু...আর শীত তেমন বেশি পড়ে নি এখনও, কি বলেন?" বলিয়াই বিপিন সেখান হইতে উঠিল। বাহিরে বারান্দার একপাশে একটা চৌকি পাতা ছিল,

কিয়ৎক্ষণ পরে মনে হইল যেন সে তাহার ছেঁড়া চাদরটা দিয়া চৌকির ধুলা ঝাড়িতেছে।

ভিতর হইতে বাবু ডাকিলেন, "ওহে...ওই...ও লোকটি, শোনো! শোনো!"

"আমায় ডাকছেন?"

বিপিন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবু তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"হ্যাঁ। খাবে এসো! বাইরে ঠাণ্ডায়-হিমে পড়ে' থেকো না—এই ঘরে আমার ঠাকুর শোয়—এইখানে শোবে।"

তা বাবুটি লোক ভাল। দুজনেই কাছাকাছি খাইতে বসিল।

রাঁধুনী বামুন একজন পরিবেশন করিতেছিল। বিপিনের খাওয়া আর শেষ হয় না! এমন খাওয়া সে জীবনে খুব কমই খাইয়াছে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে আর কিছু দেব কি? ভাত?"

দ্বিতীয় বারের ভাতগুলা তখন তাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মুখ তুলিয়া বলিল, "না। কিন্তু চমৎকার রেঁধেছ ভাই—বাঃ! বামুনের ছেলে—রাঁধতে-বাড়তে আমিও এক-আধটু জানি...তা বেশ, বেশ...কই ...অম্বল আর-একটুখানি, বুঝলে?...খুব সামান্য এই এতটুকুন্...বাস্!"

ঠাকুর অম্বল আনিতে গেল।

বিপিনের কথাটা বাবু শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, "রাঁধতে টাঁধ্‌তে জানেন নাকি আপনি?"

ঘাড় নাড়িয়া বিপিন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, খুব ভাল।—পোলাও, মাংস-টাংস খুব ভালই রাঁধতে পারি আমি।"

"তবে এক কাজ কর—বুঝলে?"

বাবুর 'আপনি' ও 'তুমি'তে জড়াইয়া যাইতেছিল। জলের গ্লাসটা হাত হইতে নামাইয়া বাবু বলিলেন, "ভাত রাঁধার, কাজ-টাজ করতে পার ত' করতে পার এইখানেই। আমার ঠাকুরটা বাড়ী যাব বাড়ী যাব করছে।...এই যে! কালী কি তুমি বাড়ী যাবে সত্যিই?"

ঠাকুর বিপিনের জন্ত অম্বল আনিয়াছিল। বলিল, "আজ্ঞে সে ত' আমার বলাই আছে।"

বিপিন অম্বল দিয়া ভাত মাখাইতে মাখাইতে হেঁটমুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তাহার পর হঠাৎ একসময় মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা তাই তাই! মাইনে?"

বাবু বলিলেন, "ছ'টাকা! আর খাওয়া পরা—"

বিপিন রাজি হইল। বলিল, "আচ্ছা তবে কাল থেকেই।"

কিন্তু এ চাকরি তাহার পনর দিনের বেশি টিকিল না।

শহরটি তাহাদের গ্রাম হইতে বেশি দূরে নয়, আদালতে রেজেষ্ট্রী আফিসে গাঁয়ের লোক হরদম যাওয়া আসা করে; পাছে কাহারও সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া যায় ভাবিয়া বিপিন ঘর হইতে বাহির হয় না। অনভ্যস্ত হাতে রাঁধিতে তাহার দেরি হয়—এক ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা লাগে।

বাবু বলেন, "কি হে বিপিন, অত দেরি কেন?"

ভাতের থালাটি তাড়াতাড়ি আনিয়া তাঁহার সুমুখে ধরিয়া বিপিন বলে, "দাঁড়ান, ভাত কি অমনি যেমন তেমন করে' দিলেই হলো! একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে মানানসই করে' তবে ত'...?"

বাবু বলেন, "না, যেমন হয় তেমনি দিও। ভাতের থালায় ফুল কাটে না—বুঝ্‌লে?"

বিপিন তবু দেরি করে।

সেদিন বেলা একটুখানি বেশিই হইয়াছিল, বিপিনের রান্নাও সেদিন সুবিধামত হয় নাই। বাবু বলিলেন, "চট্ করে' কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসো—যাও!"

সেদিন হাট-বার। খাবার কিনিতে হাটতলায় যাইতে হয়, অথচ তাহাদের গ্রাম হইতে অনেকেরই সেদিন হাটে আসিবার সম্ভাবনা। বিপিন পয়সা হাতে লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবু বলিলেন, "যাও—"

বিপিন এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

"দাঁড়িয়ে রইলে যে ?"

বিপিন আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, "চাকর—"

বাবু বোধ হয় একটুখানি রাগিয়াছিলেন। বলিলেন, "তুমি নবাব নাকি ?"

বিপিনের রাগ হইতে দেরী হইল না, মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়া দিল, "আমি পারব না যেতে—"

বাবু বলিলেন, "পারবে না ত চলে যাও—"

বিপিন সেই মুহূর্ত্তেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাবুর পায়ের কাছে পয়সা গুলি ফেলিয়া দিয়া, বাহিরের ঘরে গিয়া তাহার জামা পরিল, চাদর লইল এবং ছেঁড়া ছাতাটি বগলে করিয়া বাবুর কাছে আসিয়া বলিল, "দিন্ মাইনে—"

পনর দিনের মাহিনা তিনটি টাকা বাবু তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "খবরদার আর আমার দো'র মাড়িও না বলে দিচ্ছি।"

রাগে আর বাবু বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। বিপিনেরও রাঁধা ভাত রান্নাঘরেই পড়িয়া রহিল। তিনটি টাকা মাত্র পকেটে ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

"আঃ বাঁচলাম বাবা—ভাত রাঁধার চাকরি আবার মানুষে করে ?"

সটান্ কলিকাতায়...

রাঁধিতে হয়ত এখানেই রাঁধিবে।

না আছে একটা চেনা মুখ না আছে কিছু।

তবে একবার কালিঘাটে চান্ করিয়া আসা ভাল। বহুত পাপ সে করিয়াছে। না হইলে কি আর ঘরছাড়া হয়!

স্নান করিয়া মন্দিরে পূজা দিয়া বিপিন পথে পথে ঘুরিতেছিল। দু'পাশে দোকানদানি, বাড়ীঘর, লোকজনে একেবারে একাকার!

পাশেই একটা বাক্সের দোকানে টিন্ পিটাইতেছে। তাহার পাশেই একটা ডুগি-তবলার দোকান।

বাঃ, লোকটা বেশ তবলা বাজায় ত! বিপিন পথে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিল। ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিল—বাঃ, বেশ হাত!

পটো পাড়ায় তখন জগদ্ধাত্রী গড়ার ধুম পড়িয়া গেছে। ছোট বড় নানা রকমের ঠাকুর কতক রাস্তায়, কতক বা চালায়,—কতক শুকাইতেছে কতক বা রং চড়িতেছে।

কারিগর তখন একটি প্রতিমার কাপড়ের উপর রং ফলাইতেছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিপিন এক দৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল—

"উঁহু! ও কি হ'ল ? ওখানে ত ও রং হবে না।"

কারিগর হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "কে হে তুমি ?"

বিপিন তখন ছেঁড়া জামার আস্তিন গুটাইতেছে। বলিল, "দেখবে ? দেখিয়ে দিচ্ছি।" চালার উপরে চড়িয়া গিয়া বলিল, "দাও তুলি!"

কারিগর প্রথমে তুলি দিতে ইতস্তত করিতেছিল, কিন্তু বিপিন ছাড়িবার পাত্র নয়, এক রকম্ জোর করিয়াই হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কাপড়ের উপর রং ফলাইতে বসিয়া গেল।

কারিগর দেখিল লোকটা তুলি চালাইতে জানে। এবং বোধ করি বেশ ভালই জানে। বলিল, "করবে, তুমি কাজ করবে ?"

বিপিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

কারিগর বলিল, "ঠিকের কাজ—পিতিমে পিছু চার আনা।"

আচ্ছা তাই তা—ই!

বিপিন পকেট হইতে তাহার চশমা জোড়াটি বাহির করিয়া কানের সঙ্গে আঁটিয়া বাঁধিল। বলিল, "সাহ'ক

কিছু পেলেই বাঁচি"—এবং বলিয়াই সে আবার তুলি চালাইতে লাগিল।

তা বিপিনের বাহাদুরী আছে।

এক সঙ্গে চারটি প্রতিমা রং করিয়া তুলি ছাড়িয়া সে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, প্রতিমা রাঙাইতে হইলে তখন আলোর দরকার।

বলিল, "কিছু খেতে হবে যে দাদা।"

কারিগর আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "হোটেল। এই যে ওই গলির মোড়েই।"

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। চালা হইতে পথে একবার থামিয়াও গেল। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া হাত পাতিয়া বলিল, "কিছু চাইত দাদা খেতে হ'লে ?"

"হুঁ"—চার আনা পয়সা দিয়া কারিগর বলিল, "চৌদ্দ পয়সা লাগে—"

এবার কাজটা তাহার মনের মত।

আপন মনেই ঠাকুর গড়ে, রং দেয়, হোটেলে খায় আর সেইখানেই পড়িয়া থাকে—বিপিনের দিন মন্দ কাটে না।

ঘরে সেদিন পনর টাকা পাঠানো হইয়াছে। মাসের শেষে আরও কিছু পাঠাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

চরণ চিঠি দিয়াছে, তাহারা ভালই আছে।

ঠাকুর গড়িতে গড়িতে বিপিন আবার গানও গায়। ছোট একটা হুঁকাও সে সেদিন কিনিয়া আনিয়াছে। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া তামাক টানে।

এক এক সময় নির্জ্জনে যখন বসিয়া থাকে—রং দেওয়া প্রতিমাগুলির মুখের পানে একদৃষ্টে তাকায়, নিজেই নিজের বাহাদুরীর তারিফ করে।

তারিফ করে আর হাসে।

কারিগর দেখিতে পাইলে বলে, "ঠাকুরের কি মাথা গরমের ছিট্ আছে নাকি ?"

বিপিন রাগিয়া ওঠে, বলে, "মাথা গরম কি ? ছিট্ আবার কিসে ?"

কারিগর বলে, "বেশ বেশ—সরস্বতী পুজো আসচে—বায়না নেবো কিন্তু দুশো ঠাকুরের—পারবে ত ?"

তামাক টানিতে টানিতে বিপিন বলে, "খুব খুব—দুশো ছেড়ে দুহাজার নাও। এ বাবা বিপিন ঘটক আর কেউ নয়, হেঁ—হেঁ"—বলিয়াই সে হো হো করিয়া হাসিতে থাকে।

দু'শো সরস্বতীর বায়না...

বিপিনের খাওয়া পরার অবসর নাই। নিজেই সব করে, বলে "শরৎ তুমি বসে থাকো।"

শরৎ বলে, "বেশ বেশ—"

সময় কম।

বিপিন দিনেও কাজ করে, আবার রাত্রেও।

একটির পর একটি রং চলিতে থাকে,—দুশো ঠাকুর চালার উপর সাজানো।

পাশেই স্যাক্‌রার দোকানের ঠুক্‌ঠাক্ আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায়। মাড়োয়ারীর আড়তের বচসা থামে। রাস্তার ঝামেলা নিস্তব্ধ হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতে থাকে। বিপিনের তুলি চলে। কাপড়ের রং হয়। প্রত্যেকটি প্রতিমার পায়ের নীচে পদ্মের পাপ্‌ড়িগুলি একে একে যেন ফুটিয়া উঠে। হাতের বীণা-যন্ত্রের তারগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু চোখ তখনও হয় না। বিপিনের কেমন যেন ভয় করিতে থাকে।—চোখের কাছে তুলি লইয়া গিয়া সে চুপ করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়—নিস্তব্ধ পথের প্রান্তে গ্যাসের আলোর দিকে একবার তাকায়—গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বসে। তাহার পর কালো রঙে তুলি ডুবাইয়া আবার তাহার কাজ সুরু করে।

একটি প্রতিমার চক্ষুদান শেষ হয়। বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়। পিছু হাঁটিয়া দূর হইতে তাকাইয়া দেখে। আবার কাছে আসিয়া বসে। মাটির প্রতিমা যেন জীবন্ত হইয়া উঠে। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির নির্জ্জনতা সে আর টেরও পায় না।

চারশ' চোখ যখন শেষ হইল—বিপিনের চোখ তখন জড়াইয়া আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ।

বিছানা পাতাই ছিল। আলো নিভাইয়া দিয়া বিপিন শুইয়া পড়িল। অন্ধকার—তবুও মনে হয় দু'শ জোড়া চোখ যেন অনিমেষ নয়নে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। তাহারই দিকে......

দু'শ সিকি। পঞ্চাশ টাকা!

বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে,—ঘরখানি তাহার হঠাৎ সেদিন আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেছে। খড় চাই—কাঠ চাই! পঞ্চাশ টাকা লইয়া সে বাড়ী যাইবে। ভয় কি?

উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগার ঘুম!

সকালে ঘুম তাহার আর ভাঙে না!

শরৎ কারিগর অন্যদিন অতি প্রত্যুষে আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া দেয়, সেদিন আর আসে নাই।

বেলা প্রায় ন'টার সময় শরৎ আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল।

"ঠাকুর কই ঠাকুর? পিতিমে?"

ধড়মড় করিয়া বিপিন উঠিয়া বসিল। সমস্ত চালাটা একেবারে ফাঁক! মোটে দশটি প্রতিমা তখনও সারিবন্দী সাজানো রহিয়াছে।

বিপিন বলিল, "কোথা গেল পিতিমে-গুলো?"

শরৎ বলিল, "ঘুমিয়েছিলে ত' নাকে তেল দিয়ে? বেশ—।"

রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত চোখদুটি বিপিনের তখন কাঁপিতেছে।

"সে কি!"

শরৎ যেন অত্যন্ত রাগিয়া গেল। বলিল, "এ ক্ষেতিটা কে শুনবে শুনি?"......

বিপিনের কানে কিন্তু কোনও কথাই গেল না। সে তেমনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

শরৎ যেমন আসিয়াছিল, তেম্‌নি চলিয়া গেল। যোগ-করি যাইবার সময় মনে মনে খানিকটা হাসিয়াও গেল।

তামাক সাজিয়া হুঁকাটি হাতে লইয়া বিপিন টানিতে বসিল। দশটি প্রতিমা মোটে!

একটির মুখের পানে বিপিন একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তামাক টানিতে সে ভুলিয়া গেল। চমৎকার! ঠিক যেন জীবন্ত! বিপিনের চোখে পলক আর পড়ে না। প্রতিমার চোখদুটি যেন জ্বলিতেছে।

হঠাৎ বিপিন যেন তন্দ্রার ঘোরে লাফাইয়া উঠিল—

"দেখতে পাস্‌নি? এত বড় বড় চোখ নিয়ে দেখতে পাসনি তুই?"

হাতের হুঁকাটা বিপিন সেই মাটির প্রতিমার মাথার উপর ভাঙিয়া ফেলিল।

হুঁকাও গেল—প্রতিমাও গেল।

"যাঃ—!"

"আর তুই?"

আর একটা প্রতিমার মুণ্ডটা বিপিন দুই হাত দিয়া সজোরে টানিয়া একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিল—

"মর্! মর্ এইখানে!"

তাহার পর,—আর একটা!

তাহার পর—সব।

লাথি মারিয়া মাটির প্রতিমাগুলি বিপিন চুরমার করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে একাকার করিয়া ফেলিল। রাগে তাহার চোখ দুইটা তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে।

যাক্—সব যাক্।

দেওয়ালের পেরেক্ হইতে তাহার সেই পুরানো ছাতাখানি তুলিয়া লইয়া বিপিন পথে নামিয়া আসিল।

কোথায় চলিতেছে—তাহার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই......শহরের অফুরন্ত পথ!

মুখে-চোখে তখনও পর্য্যন্ত একটুকু জল পড়ে নাই। পিপাসাও পাইয়াছে বটে! পথের ধারে একটা জলের কল। কয়েকটা হিন্দুস্থানী মেয়ে বাসন মাজিয়া উঠিয়া গেল।

বিপিন ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া কলের নীচে অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল। বাঁ হাত দিয়া সজোরে কলটা টিপিয়া ধরিতে ছির্ ছির্ করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ একটুখানি জলের ধারা কলের মুখ বাহিয়া পড়িয়াই আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল। আবার টিপিল—কিন্তু কলের জল তখন বন্ধ হইয়া গেছে, ভিজা হাতটা বিপিন তাহার চোখের উপর বার-কতক্ বুলাইয়া লইয়া সুমুখে রৌদ্রতপ্ত পথের উপর নামিয়া পড়িল।

কিন্তু কোথায়...?

—ভারতী, আশ্বিন, ১৩৩৩

চন্দ্রবিন্দু

গীত-পঞ্চক

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সকাল বেলার আলোয় বাজে
বিদায়ব্যথার ভৈরবী,
আন্ বাঁশি তোর আয় কবি॥
শিশির-শিহর শরৎ-প্রাতে
শিউলিফুলের গন্ধসাথে
গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়;
নাই যদি রোস্ নাই র'বি॥
এমন উষা আসবে আবার
সোনায় রঙীন্ দিগন্তে,
কুন্দের ফুল সীমন্তে।
কপোত-কূজন করুণ ছায়ায়,
শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুর-মুখর
জাগ্‌বে আবার এই ছবি॥

স্টুর্ববর্গ, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬

২

ভালো লাগার শেষ যে না পাই, প্রহর হ'ল শেষ।
ভুবন জুড়ে রইল জেগে আনন্দ আবেশ॥
দিনান্তের এই এক কোণাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধহাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল দেহ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ॥

ইুটগার্ট, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬

৩

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হ'তে
নিকটে নিতে টানি॥
রাখিতে চাহো, বাঁধিতে চাহো যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,

বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী ॥
দিবসরাতি দেব-সভার মাঝে
যে সুধা করে পান,
পরশ তার মেলেনা, মেলেনা যে,
নাহি যে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরীমাখা হাসিতে, আঁখিকোণে,
সে সুধারস পিয়ো আপনমনে,
নিয়ো তাহারে জানি ॥

কল্যোন্, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬

৪

আপন গানের টানে, তোমার
বন্ধন যাক্ টুটে।
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে
কাঁদন জেগে উঠে ॥
বিশ্ব-কবির চিত্তমাঝে
ভুবনবীণা যেথায় বাজে,
জীবন তোমার সুধার ধারায়
পড়ুক সেথায় লুটে ॥
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে
দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে।
অন্তরে আর বাহিরে তাই
তান মেলেনা তানে।
সুর-হারা প্রাণ বিষম বাধা,
সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা,
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে,
যাক্ সে আপদ ছুটে ॥

ব্রুসেলডর্ফ, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬

৫

আপনি আমায় কোন্ খানে
বেড়াই যে সেই সন্ধানে।
নানান্ রূপে, নানান্ বেশে,
ফেরে যে জন ছায়ার দেশে,
তার পরিচয় কেঁদে হেসে
শেষ হবে কি, কে জানে ॥
আমার গানের গহন মাঝে
শুনেছিলাম যার ভাষা,
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন্ যায় গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকালবেলার মূলতানে ॥

বার্লিন, ৬ই অক্টোবর ১৯২৬

—সবুজপত্র, কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

মুসায়েরা

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন

অনেক দিনের কথা; তখন সবে মাত্র লক্ষ্ণৌতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এ দেশীয় কয়েকটি সুকবির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন—হামিদআলি খাঁ। খাঁসাহেব এক সময় ব্যারিষ্টারি করিতেন, কিন্তু অগত্যা সে ব্যবসায়টা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি উর্দ্দু কবিতা ও হোমিয়োপ্যাথি চর্চ্চায় ব্যস্ত। উর্দ্দু ভাষায় তিনি একজন সুকবি বলিয়া জনসমাজে বেশ যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজি কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু খ্যাতি ছিল। তবে সেটা বন্ধুবর্গ উপহাস-চ্ছলেই উল্লেখ করিতেন। যৌবনাবস্থায় বিলাতে অবস্থান

কালে তিনি নাকি রমণীগণের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সমসাময়িক একজন বন্ধু তাহার দুই একটি নমুনা আমাকে শুনাইয়াছিলেন। সেগুলি শুনিলে আদিরসের উদ্রেক হউক বা না হউক, হাস্যরসের উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। বোধ হয় খাঁসাহেব একই কারণে ব্যারিষ্টারি ও ইংরাজি কবিতা রচনা উভয় চেষ্টা হইতে বিরত হন। আমি তাঁহাকে আচকান্, দোপল্লি টুপি ও চুড়িদার পায়জামা ছাড়া অন্য কোন পরিচ্ছদে দেখি নাই।

একদিন তিনি আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন, 'সেন, চলো মায় তুমকো মুসায়েরা মে লে চলুংগা'। তখন আমার উর্দ্দু বিদ্যা নিতান্ত প্রাথমিক। বিহার অঞ্চলের চাকরদের কাছে শেখা বাঙ্গলা-ভাঙ্গা বিকৃত হিন্দি তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—খাঁসাহেব, মুসায়েরা ব্যাপারটা কি? হয়ত বলিয়া থাকিব, 'খাঁসাহেব মুসায়েরা ব্যাপার ক্যা হায়?' তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্ণৌ আসিয়াছ আর, কমবখৎ, এও জাননা মুসায়েরা কাকে বলে?" তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসায়েরার অর্থ কবি-সম্মিলন, যেখানে আমন্ত্রিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। আমার শুনিয়া লোভ হইল; বলিলাম, —চল; কিন্তু খাঁসাহেব, একটু কাছে বসাইও, বুঝাইয়া দিতে হইবে। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু শোন; যেখানে যাইবে সেখানে ইংরাজি সভ্যতা এখনও প্রবেশ করে নাই; সে স্থানটি প্রাচীন লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রস্থল, সেখানকার লোকদের বেশ-ভূষা, ভাষা আচার-ব্যবহার ঠিক নবাব আসফাদ্দৌলার সময়ে যা ছিল তাই; তাহারা ইংরাজি কহেনা; ইংরাজি জানেনা; বস্তুতঃ তাহারা ইংরাজি ভাষাকে ও ইংরাজি সভ্যতাকে ঘৃণা করে। এসব শুনিয়া আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম; ভাষা ও বেশ সম্বন্ধে মনে নানা প্রকার দ্বিধা ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। খাঁসাহেব বলিলেন,—শীঘ্র চল, বেশ পরিবর্তন করিয়া লও। তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থানী ও বিদেশী মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া খাঁসাহেবের সঙ্গে চলিলাম। তখন পর্য্যন্ত একেবারে খাঁটি খাঁসাহেবটি সাজিতে একটু সংকোচ বোধ করিতাম। আমার বন্ধুটি হিন্দুস্থানী পোষাকের সপক্ষে অনেক অকাট্য যুক্তি দর্শাইলেন; আমাকে স্বীকার করিতেই হইল যে হিন্দুস্থানী বেশ ইংরেজি পোষাক অপেক্ষা অধিকতর শোভন, সহজ, ও সঙ্গত। তদবধি কার্য্যতঃ কখনও কখনও এ মতের পোষকতা করিয়া থাকি।

লক্ষ্ণৌর একটি পুরাতন পল্লীর পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ী থামিল। আঁকা বাঁকা অনেকগুলি সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিলাম, কেননা সে গলিতে গাড়ী চলিতে পারে না। দুদিকে জীর্ণ ইমারত—জন্মাবধি কখনও তাহার সংস্কার হয় নাই; দুই পার্শ্বে সেই সনাতন আবর্জ্জনা; আবার সেই অপরিষ্কার গলির দুই ধারে দধি, 'বালাই', (লক্ষ্ণৌতে মালাইকে বালাই বলে) কবাব, রুটি, জিলেবী, বরফি ইত্যাদি খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের দোকান ও তৎসঙ্গে যথেষ্ট মাছি। মাঝে মাঝে দু-একটি ভাঙ্গা ও ছাড়া বাড়ীর ভাঙ্গা কামরায় ছিন্ন-বসন বা বিবসন আফিমসেবিগণ নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্তিমিত নেত্রে বিশ্রাম করিতেছেন। পানের দোকানের অবধি নাই; দু পা হাঁটিলেই এক একটি পানের দোকান। এখানকার মুসলমানেরা পান করেন না বটে কিন্তু পান খান অজস্র। এরূপ গলির ভিতর দিয়া প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। গৃহের দ্বারেই গৃহকর্ত্তা করযোড়ে দাঁড়াইয়া। খাঁসাহেবকে দেখিয়াই তিনি "তসলিমাত্ আরজ খাঁসাহেব, তসরিফ্ লাইয়ে" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আরও অনেক ফারসি-বহুল উর্দ্দু ভাষায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। খাঁসাহেব সৌজন্যের রাজা, তিনি প্রত্যুত্তরে ভূয়সী সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, এবং দাঁড়াইয়া মাথা একটু নত করিয়া দুই হাতে একসঙ্গে তিনবার সেলাম করিলেন। আমি পড়িলাম মুস্কিলে;

পূর্ব্বে কখনও দুই হাতে কিম্বা একসঙ্গে একবারের বেশী সেলাম করি নাই। আমি অতি সন্তর্পণে খাঁসাহেবের অনুকরণ করিলাম। পরিচয়ের পর নিমন্ত্রাতা আমাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

যাহা দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। দেখিলাম, সেখানে কবিবৃন্দ গোলাকারে বসিয়া আছেন; খাঁসাহেবকে দেখিবামাত্র তাঁহারা সকলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং সৌজন্য প্রকাশের একটা কলরব পড়িয়া গেল। এক সঙ্গে এতগুলি হস্তযুগলের উত্তোলন ও আন্দোলন আমার কাছে এক প্রকার ব্যায়াম বলিয়া ঠেকিল। সকলে আমাদিগকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। খাঁসাহেবের এরূপ প্রভূত সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি একজন যশস্বী কবি। খাঁসাহেব কবিদের পংক্তিতে বসিয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বসিলাম। তাঁহাদের বসিবার প্রণালী ঠিক আমাদের বাঙ্গালীর মতন নয়। তাঁহারা হাঁটুর উপর ভর করিয়া একটু অগ্রদিকে হেলিয়া হাত দুটি জানুর উপর রক্ষা করিয়া বসেন। পিছনে তাকিয়া নাই; প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া মৃৎভাণ্ড, তাহাতে পান রাখা। কিছু দূরে দূরেই একটি করিয়া উগালদান; তাহার কারণ, লক্ষ্ণৌর পানে তাম্বুলের মাত্রা একটু অধিক। কিন্তু মুসায়েরার আসরের একটি বিধি এই যে, গজল পাঠের সময় কেহ ধূমপান করিতে কিম্বা পান খাইতে পারিবেন না। মাঝে মাঝে যখন পাঠের বিরাম হয় সে অবসরে তামাকু ও পান খাইয়া লইবেন।

আগত কবিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খাঁ সাহেব, ঐ ফর্সা সুপুরুষটি কে?' উত্তরে জানিলাম উনি একজন কাশ্মীরী হিন্দু কবি—তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। ঐ রোগাপানা, আচকান গায়ে, দোপল্লি টুপি উল্টোভাবে পরা, বিষণ্ণবদন মুসলমানটি কে?—উনি একজন প্রসিদ্ধ মারসিয়াখান্; অর্থাৎ তিনি মারসিয়া শোক-সঙ্গীত খুব ভাবের সহিত সুন্দরভাবে পাঠ করেন, আর উত্তম কবিতাও লেখেন। উনি কে? ঐ যে লম্বিতকেশ, কুঞ্চিত কুন্তল, প্রকাণ্ড মাথার অগ্রভাগে একটি অতি ক্ষুদ্র টুপি, ঢুলু ঢুলু অর্দ্ধনিদ্রিত (হয়ত অহিফেন সেবন করেন) স্থূলকায় পুরুষটি? উনি? উনি একজন বিখ্যাত কবি; সাহীযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আতসের বংশধর, ইঁহার সমকক্ষ কবি এখন লক্ষ্ণৌতে নাই। আর ঐ যে তাঁহার পার্শ্বে অত্যন্ত কৃষ্ণকায়, অতি সাধারণ পোষাক পরিয়া হাস্যবদনে বসিয়া আছেন, উনি কে? ও লোকটি? শুনিয়া হয়ত হাসিবে, ইনি এক্কাওয়ালা নামে সাহেব, লক্ষ্ণৌর একজন সুকবি; দিনের বেলা এক্কা হাঁকান; লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন এবং স্বরচিত গজল মুসায়েরাতে পাঠ করিয়া বেশ যশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার তথল্লুস্—সফিক্। তথল্লুস্ মানে কবির একটি বিশেষ নাম। এদেশে কবি মাত্রেরই এক একটি করিয়া তথল্লুস্ থাকে; এ নামে তাঁহারা কবিসমাজে পরিচিত; কবিতার অন্তিম চরণে এ নামেই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন।

এইরূপ হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবক শ্বেতবর্ণ ও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নানা শ্রেণীর কবিগণ সে সভায় আসীন। আমার দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। কবি সমাজে এরূপ সাম্য বড়ই সুদর্শন। তারপর পাঠ আরম্ভ হইল। কেহ সুললিত কণ্ঠে সুর করিয়া নিজের রচনা আবৃত্তি করিলেন; কেহ একটু নাকি সুরে, কেহবা গুরুগম্ভীর নিনাদে স্বীয় কবিতা পাঠ করিলেন। সকলেরই উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, একেবারেই দ্রুত নয়। ইহাদের পাঠ করিবার প্রণালী অতি সুন্দর।

মুসায়েরার পদ্ধতিটা এই। যিনি মুসায়েরা আহ্বান করেন তিনি নিমন্ত্রণ পত্রে নিম্নভাগে দুই এক চরণ কবিতার নমুনা লিখিয়া পাঠান; তাহাকে বলে 'মিশ্রা-তরাহ'। মিশ্রাতরাহর শেষ কথাটিকে বলে 'রদিফ্'। আর ঠিক তাহার পূর্ব্বের শব্দটিকে বলে 'কাফিয়া'।

একটি উদাহরণ দিতেছি:—

'দিলহি ঘুথা হুয়া হো তো লুত্ফ্-এ বাহার ক্যা'

ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ :—

শুষ্ক যদি অন্তর আমার, বসন্তের আনন্দ কোথায়?

এ পংক্তিটির 'ক্যা' শব্দটি রদিফ্, আর 'বাহার' শব্দটি কাফিয়া। বাঙ্গলাতে হবে 'কোথায়' কথাটি রদিফ্ আর 'আনন্দ' কথাটি কাফিয়া।

এখন, নিমন্ত্রণ পত্রে যদি কেহ এই মিস্রাতরাহটি লিখিয়া পাঠান :—

'দিলহি বুঝা হুয়া হো তো লুতফ্ এ বাহার ক্যা।

তবে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রিত কবিগণ মুসায়েরায় পাঠ করিবার জন্য যে গজলটি লিখিয়া আনিবেন তাহার প্রত্যেক দ্বিপদীর দ্বিতীয় চরণের কাফিয়া হবে 'বাহার' অর্থাৎ বাহার কথার সঙ্গে মিল থাকিবে; আর শেষ কথাটি হবে 'ক্যা'। যথা :—

'চলতি হুয় ইস চমনমে হাওয়া ইনকিলাব্ কি
শবনম্ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা।"

এখানে 'বাহার' ও 'করার' এর কাফিয়া মিলিল; আর রদিফ 'ক্যা' ও রক্ষা হইল। উপরি উক্ত কবিতার বাঙ্গলা অনুবাদ :—

হেথাকার ফুল-বনে সদা চলে পবন চঞ্চল
তাইত শিশির-বিন্দু পুষ্পকোলে সদা টলমল।

সর্ব্বপ্রথমে নিমন্ত্রাতা কোনও বিখ্যাত কবির দুই একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া মুসায়েরা আরম্ভ করেন। তারপর কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করেন। গজল ছাড়া মুসায়েরাতে আর কোন রকম কবিতা পাঠ করা নিয়মবিরুদ্ধ। নিমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও মাননীয় কবি তাঁহাকেই সচরাচর প্রথমে পাঠ করিতে অনুরোধ করা হয়। অনেক সময় তিনি কৃত্রিম বিনয় অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার আপত্তি প্রকাশ করেন, —'আমি এখন সেকালের, আজকালকার নবীন কবিদের আমার কবিতা ভাল লাগিবে কেন? ইহাদিগকে প্রথমে পড়িতে বলা হউক'। অমনি সভাস্থ সকলে একবাক্যে তাহার প্রতিবাদ করেন, হয়ত বলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখনও আপনার ন্যায় কবি জীবিত আছেন—ইত্যাদি'; এরূপ অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশের পর নিজের আঙ্গরাখার পকেট হইতে একটি পরচা বাহির করেন। তাহাতে স্বরচিত গজলটি লিখা। একটি সৌজন্যসূচক সেলাম করিয়া তাঁহার গজলটি পড়িতে আরম্ভ করেন। দ্বিপদী গজলের প্রথম পদটি আবৃত্তি করিলে পর সভাস্থ কবিকুল সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে করুন উনি পাঠ করিলেন, 'চলতি হুয় ইস চমন্‌মে হাওয়া ইন্‌কিলাব্ কি'। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল 'চলতি হুয় ইস চমন্‌মে হাওয়া ইনকিলাব কি'। তার পর কবি নিয়ন্ত্রিত কাফিয়া-সংযুক্ত দ্বিতীয় চরণটি পাঠ করিলেন; 'শবনম্ কো আয় দামনে গুল মে করার ক্যা'। যেমনি দ্বিতীয় চরণটি পড়িলেন অমনি কবিবৃন্দ ও শ্রোতৃগণের প্রশংসা-ধ্বনির কলরবে গৃহটি পরিপূর্ণ হইল। কেহ বলিল— 'আ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' কেহ বলিল— 'সুভনাল্লা, ফির দোহরাইয়ে'; কেহ বলিল—'ক্যা খুব মিস্রা লাগায়া'; কেহ বলিল—'ওয়াহ ওয়া, আপনে বেনজীর মিস্রা কহি' এইরূপ আরও অনেক স্তুতিবাদ। কবি তখনই উঁচু হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া সেলাম করিতে লাগিলেন, এবং কবি-ভ্রাতাদের প্রশংসাবাদের জন্য অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। একটি কবির গজল পাঠ শেষ হইলে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কবিটির পালা; এবং ঠিক সেই রূপ পুনরাবৃত্তি, সেইরূপ প্রশংসাধ্বনি, এবং ঠিক সেইরূপ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেলাম। এইরূপ পাঠপরম্পরায় কবি-চক্রটি সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হইলে পর সর্ব্বশেষে নিমন্ত্রাতা আপনার রচিত গজলটি পাঠ করেন। সৌজন্যের জন্যই হউক বা কাব্য মাধুর্য্যের জন্যই হউক প্রশংসার মাত্রাটা তাঁহার ভাগ্যেই একটু বেশী পড়ে।

মুসায়েরা চক্রটি একটি মধুচক্র; ইহার আকর্ষণ অসাধারণ। চারিদিক হইতে এমন কি সুদূর নগর ও গ্রাম হইতে কাব্যামোদিগণ 'মধুগন্ধে অন্ধ অলি'র ন্যায় তথায় আসিয়া একত্রিত হন। অনেক মুসায়েরাতে অতি মনোরম ও উচ্চাঙ্গের গজল পাঠ করা হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌতে একটি মুসায়েরা হয়, তার

গর্ব্ব আজও অনেক লোকে করে। সে মুসায়েরার ভাল ভাল কবিতাগুলি অনেক কাব্যপ্রিয় লোকেরই কণ্ঠস্থ। উদাহরণচ্ছলে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। যিনি মুসায়েরা আহ্বান করিলেন তিনি নবাব ওয়াজিদালি সাহের সময়কার বিখ্যাত কবি আতস্-এর একটি গজল হইতে 'মিস্রাতরাহ' লিখিয়া পাঠান। তার দুটি চরণ এই :—

'দো রোজ হ্যয় ইয়ে লুতফ ও নায়েস ও নিস্‌বৎ দুনিয়া
বুই সবাই উরুছি মেহমান হ্যয় পিরহন মে।'

বাঙলা অনুবাদ :—

দুদিনের তরে হায়, সংসারের সুখ শান্ত যত।
বধূর বাসরবাসে ক্ষণস্থায়ী সুগন্ধের মত।

মুসায়েরা সম্মিলনে অনেক সুকবি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গজলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সুকবি 'হাকিমের' গজলের দুইটি লাইন :—

'কির গয়ের গয়েরুছি হ্যয় গো হ্যয় উস্ অঞ্জুমন মে ;
বেগানগি সবজা বাতি নেহি চমন্ মে।'

'পিরহনবে' আর 'চমন্‌মে'র কাফিয়া মিলিল।

বাঙলা ভাবানুবাদ :—

যদিও সে একসঙ্গে লভেছে আসন
তথাপি সে পর, কভু হবে না আপন ;
ফুল-বনে বন ঘাস উঠে ফুল পাশে ;
ফুলত চায়না তারে মনে উপহাসে।

এ কবিতাতে প্রতিযোগী প্রেমিকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে।

সুকবি 'মজর আলা'র গজলের দুটি চরণ :—

'আজ ও মজাজ মেহেঁ বুলবুল কে আওর গুল্ কে,
হামভি চলে চমন্ মে তুমভি চলো চমন্ মে।'

বাঙলা অনুবাদ :—

চল বধূ দুজনাতে যাই ফুল-বনে
দেখিগে ফুলের লীলা বুলবুলের সনে।

কবি 'ইউসুফের' গজলের দুটি পদ :—

'সাগর ভরে ধরে হ্যয় সাকী কি অঞ্জুমন্ মে।
তহ রহে হ্যয় কৌসর ফিরোজ কে চমন্ মে।'

বাঙলা :—

সুরা-পাত্র উছলিত সাকীর সভায়
নন্দন উদ্যানে যেন মন্দাকিনী ধায়।

সুকবি পণ্ডিত 'বিষণনারায়ণ দর' এ-সভায় তাঁহার সুন্দর গজল পাঠ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি লক্ষ্ণৌতে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতার কংগ্রেস সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গজলের দু'টি চরণ এই :—

'গুল্‌কে যো কাণ ওড়াই বক্ বক্‌কে বুলবুলোনে,
বোলি কলি ছিটক্ কর ক্যা সোর হ্যয় চমন মে।'

বঙ্গানুবাদ :—

বুলবুলের গোলমাল শুনি ফুল-বন,
হইল অধীর, তার বধির শ্রবণ।
হেনকালে জাগি উঠি মেলি আঁখি-পাতা
ফুলকলি ফুকারিল—কার গোল হেথা ?

নবাব ওয়াজিদালি সাহের সময়ে মুসায়েরার খুব আদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সে সময়কার মুসায়েরার গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিদালি সাহ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদশাহ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুসায়েরাতে সরীক হইতেন। সে সময়ে কয়েকটি কবি খুব যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একজনের কবিনাম 'আতস্', অন্যজনের কবি-আখ্যা 'নাছিখ্'! উভয়েই প্রতিভাশালী কবি ; তবে আতসের প্রতিভাই উজ্জলতর। অনেকে বলেন যে 'আতস্' লক্ষ্ণৌর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও

ছিল। নাছিখ্ ছিলেন একটু উদ্ধত। উভয়ের শিষ্য ও স্তাবকের সংখ্যা বিস্তর।

একবার একটি বিখ্যাত মুসায়েরাতে দুজনেই আহুত হয়েন। নাছিখের বয়স্যেরা আতস্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিল। নাছিখ্ ও তাঁহার দলবল নিরূপিত সময়ের অনেক পূর্ব্বেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুসায়েরার চক্রটিকে অধিকার করিয়া বসিলেন। আতস্ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ যখন আসিলেন তখন ঘর পূর্ণ। আতসের জন্য অবশ্য স্থান হইল; কিন্তু তাঁহার সহচরগণকে স্থানাভাবে পশ্চাতে বসিতে হইল। প্রথমেই পাঠ করিলেন নাছিখ্। তারপর তাঁহার শিষ্যবর্গ খুব লম্বা লম্বা গজল বিশেষ আস্ফালনের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনভাবে তাঁহারা তাঁহাদের কবিতা আওড়াইলেন যেন তাহাতেই রাত্রিটি কাটিয়া যায়, যেন আতসের আর গজল শুনাইবার সুযোগ না হয়। রাত্রিও শেষ হইল—তাঁহাদের গজলপাঠও সমাপ্ত হইল। এবং তৎপর-মুহূর্ত্তেই নাছিখ্ এবং তাঁহার অনুচরগণ সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন; ভাবিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই মুসায়েরাও সাঙ্গ হইবে, শ্রোতৃবর্গের আর ধৈর্য্য থাকিবে না। কিন্তু বহুলোক আতসের গজল শুনিবার জন্য উৎসুক। তাঁহারা নাছিখের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। ঠিক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আতসের গজল পড়িবার সময় আসিল। আতস্ তখন তখনই নাছিখ্ ও তাঁহার স্তাবকগণকে নির্দ্দেশ করিয়া দুটি পদ রচনা করিলেন। তাহা এই :—

'রাতভর হর সবিতো ও সইয়ারা গরমে লাফ্ থা;
সবোকো খুরসিদ্ যব নিকলা তো মতলা সাফ্ থা।

অর্থাৎ :—

সারারাত গ্রহ তারা চমকিল গর্ব্বে মাতোয়ারা;
দিনমণি যেমনি উদিল পলাইল কোথায় তাহারা?

আতসের এরূপ অপ্রত্যাশিত ও বিদ্রূপপূর্ণ জবাবে সকলে চমৎকৃত হইলেন এবং উল্লাসে হুঙ্কার করিয়া সভাস্থলে ও সভার বাহিরে রাজপথে—'রাতভর হর সবিতো ...' এ চরণ দুটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সহরে এমন একটা জয়রোল উঠিল ও হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, নিশান্তে নিদ্রিত বাদশা ওয়াজিদালি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত গোলমাল কিসের? নিশ্চয় কোথাও ডাকাত পড়িয়াছে; যাও শীঘ্র সিপাহী-দিগকে খবর দিতে বল।' সিপাহিরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হুজুর, ডাকাত নয়, মুসায়েরার কবি আতস নাছিখের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ব্ব্যবহারের এমন উচিত জবাব দিয়াছেন যে, সহরময় তাঁহার জয়োল্লাসধ্বনি উঠিতেছে।' বাদশাহ কবিতাটি শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আতসকে ডাকিয়া ইনাম দিলেন।

এ ত গেল সাহি-জমানার কথা। আজকালও মুসায়েরা এদেশে খুব প্রচলিত ও সমাদৃত। নগরে নগরে—এমন কি গ্রামে গ্রামেও মুসায়েরা হইয়া থাকে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরাও মুসায়েরা উৎসব করে। এখনও মুসায়েরার মজলিসে বেশ ভাল ভাল গজল শুনিতে পাওয়া যায়। তবে নিকৃষ্ট রচনাও কখনও কখনও প্রশ্রয় পায়; এমন কি তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। সময় সময় শুধু ব্যঙ্গ রসের অবতারণার জন্য এরূপ নির্ব্বোধ গজল-রচয়িতাকে আহ্বান করা হয়। আমি নিজে দেখিয়াছি, একজন রচয়িতা নিতান্ত অর্থশূন্য ও বালকসুলভ কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন এবং তাহা শুনিয়া শ্রোতারা খুব তারিফ্ করিতেছে এবং কবি কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে সকলকে সেলাম করিতেছে। অল্পবুদ্ধি বুঝিতেছে না যে, সে তারিফ্ বিদ্রূপে ভরা।

* * *

মুসায়েরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিলাম। আমার মনে হয়, বাঙ্গলা-সাহিত্যসমাজে এরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

—উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৩৩

আর্টের সহজ পথ

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিতেরা হন জটিল-পন্থী—সহজ কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দুর্ব্বোধ্যতার আবরণ দিয়ে বলে যান। অনেক মাথা ঘামিয়ে ছোবড়া ছাড়িয়ে দাঁত ভেঙে নারকেলের দুধ পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য ভেদ করে পণ্ডিতের কথার ভাবার্থ ও মর্ম্মে পৌঁছনোর আনন্দ কতকটা একই ধরণের।

আর্টিষ্টরা ঠিক এর উল্টো পথ ধরে চলেন, তাঁরা স্বভাবতঃ সহজ-পন্থী। সহজ কথায় সহজ লেখায় ভাব ধরা ব্যবসা তাঁদের, রস-পাত্র সহজে পরিবেশন করতে আছেন আর্টিষ্টেরা—অথচ এইটে দেখি যে আর্টিষ্টের কাজের মধ্যে জটিলরহস্যের সন্ধান না পেলে লোকে খুসিই হয় না।

আর্টিষ্ট যে রহস্যজাল দিয়ে নিজের গোপন কথা লুকিয়ে চলেন লেখায়, আঁকায়, সুরে—তা কতকটা বর্ষার মেঘের, শীতের কুয়াশার আচ্ছাদনের মতো, মোটেই দুর্ভেদ্য নয়, ভারিও নয়—মায়া কুহেলিকার অন্তরে সত্য পদার্থ লুকিয়ে রেখে লুকোচুরি খেলা হল আর্টিষ্টের খেলা। রসিক দর্শক, পাঠক বা শ্রোতার মন উড়ন্ত পাখীর মতো কোনো বাধা পায় না সেই রহস্যের ঘের অতিক্রম করে সহজ সত্যের সঙ্গে শুভদৃষ্টি ও নিরিবিলি পরিচয় করে নিতে।

ছোট ছেলেতে যেমন সহজে দেখায় এটা তার নাক, ওটা তার চোখ, তেমনি সহজে আর্টিষ্ট ইঙ্গিত করেন রং, রেখা, লেখা, সুর-সার সব দিয়ে বলবার বিষয়টির প্রতি; কিন্তু লোকে পাণ্ডিত্য চায় আর্টিষ্টের কাছে, ঘুরিয়ে নাক না দেখালে তাদের মনঃপূত হয় না—বলে, একি হল, এত সহজে বলা হল সবটা! ভাবে লোকে, তারা ঠকে গেল—যতটা পাওয়া দরকার অথবা পাওয়ার মতো কিছুই পাওয়া হল না।

যার ফুলে সখ সে একটি গোলাপের দশ টাকা মূল্য দেয় কিন্তু যার ফুলে সখ নেই কিন্তু ফুলকপিতে লোভ সে ওজন দেখে খুসি হয়ে তবে পকেট খোলে, যদি ফুলমাত্রেই ফুল-কপি নয়, বাঁধা-কপি হয়ে উঠতো জগতে—তবে!

সহজে বলার, সহজে চলার, সহজে লেখার সাধনায় সবাই এগোতে পারে না এটা জানা কথা। সহজ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি আমরা আর্ট-সমালোচনা পড়ে পড়ে যখন, তখনই ভাবি আর্টিষ্টের কাযে একটা গভীর অর্থ জটিল সমস্যা থাকা দরকার, না হলে সেটা উঁচু দরের আর্ট হল না। —উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৩৩

গান

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন

রুমক ঝুমক রুম ঝুম্—নূপুর বাজে!
মুগধ পরাণ মম সে দু'টি চরণ যাচে!

সে নৃত্যের তালে তালে, দোলেরে কুসুম ডালে
তড়াগে মরাল দোলে হিল্লোলে তটিনী নাচে।

শিশুর চরণ টলে সে চরণ-ছন্দে;
শিখীর চরণ টলে রঙীন-আনন্দে।
বাদলের রিনিঝিনি, বাজে সেই শিঞ্জিনী
শুনি সে চরণ-ধ্বনি, নিশীথে প্রভাতে সাঁঝে!

মৃদুল মঞ্জুল কভু বাজে সে মধুর;
বেদন-মুখর কভু ধর সে নূপুর।
তরুণ হৃদয় মাঝে, তারই আগমনী বাজে
নাচে গো সে নটরাজে আমারও অন্তর মাঝে!

—উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩৩

যদি হায় দেখা না হ'ত তোমার সনে—

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নেয়ে বলে, "ওগো আর যে সময় নাই,
ঘাটে তরী বেঁধে রাখি সে সময় কৈ ?
দুস্তর নদী দিতে হবে মোরে পাড়ি
কাল-বৈশাখী অলখিতে আসে ঐ।"
—দুরু দুরু দুরু কেঁপে ওঠে সারা হিয়া।
সমুখে দাঁড়ায়ে ক্রন্দসী মোর প্রিয়া।

বারেক নয়ন তুলিয়া চাহিল সে যে
জলভরা চোখে এত কি নিষেধ মানা,
চোখের চাহনি এতটুকু, নিমেষের,
পায়ের শিকল আগে তা ছিলনা জানা!

বেপথু দেহের দুর্ব্বহ ভার, জ্বালা
সহিতে পারে কি কমল-কলিকা বালা ?

"এস তবে"—এই অতি ছোট দুটি কথা
বলিবার আগে কাঁপিল অধর দুটি,
আধেক পথেই মিলাইয়া গেল ভাষা
অশ্রু-সায়রে কমল উঠিল ফুটি!

বিদায়-বেলায় মিলনের ব্যথা জাগে,
অন্তর মন ভরে ওঠে অনুরাগে।

বারেক তুলিয়া বারেক নামায়ে আঁখি,
জ্বালায়ে আরতি পূজার প্রদীপ মালা,
ঈশানের মেঘে বিষাণ বাজিল যেই
বক্ষে আমার ঢলিয়া পড়িল বালা।

বিহ্বল দেহ বিহ্বল দুটি আঁখি—
করুণা-কাতর ব্যাধ-পলাতক পাখী !

করসম্পুটে ছিল বকুলের ফুল
গন্ধ তাহার মোহিল হৃদয় মন,
তীব্র সুখের সে কি শিহরণ দেহে—
ব্যাকুল বাহুর মধুর আলিঙ্গন।

দেহের শোণিত শিরা উপশিরা ব্যেপে,
অনল প্রবাহ ছুটে চলে কেঁপে কেঁপে।

আমার এ দুটি বাহু পাশে তারে বাঁধি'
কম্প্র বুকের উতলা ঢেউয়ের সনে,
সে কি সংগ্রাম অবিরাম ওঠা পড়া
অতলে নিতল সেই বিদায়ের ক্ষণে ?

প্রিয়া মোর বুকে নির্ভয়ে রাখি মাথা,
নির্ভর সুখে মুদিল আঁখির পাতা।

আয়ত আনন সযতনে তুলে ধরি,
যেমনি চাহিনু নীল নয়নের পানে,
অশ্রুধারায় মিশিল অশ্রুধারা
বিগত দিনের মিলন বেদনা হানে !

প্রিয়া মোরে কয়, "প্রেমের কুঞ্জবনে
যদি হায় দেখা না হত তোমার সনে।"

মাটি আর পাথর

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

জমিদার বাড়ীতে অন্নপ্রাশন। যোগীবরের আহ্লাদ আর ধরেনা।

চাঁপা বলে, এবার আর ছাড়চিনি, নঁথটি আমায় গড়িয়ে দিতেই হবে। বলিয়া ভাতের থালাটি সযত্নে স্বামীর স্বমুখে ধরিয়া দেয়।

যোগীবর হাসে। বলে, নঁথ নিবি—শিক্‌লি চাইনি? সেই পেজাপতি-আঁটা শিক্‌লি—মাথার চুলে লাগাবি? বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া ভাতের গ্রাস মুখে তোলে।

হাতের উল্টাপিঠ দিয়া চাঁপা কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছিয়া ফেলে, তারপর পরণের কাপড়খানি আঁট সাট করিয়া গুছাইয়া লইয়া বলে, হোক্‌ই আগে, তোমার কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই। গাজনের দিন ঘরে কিছু এলো?—ভক্তির চোটে সবই ত' থুইয়ে এলে! সাধ আহ্লাদ আমার কিছু কি আর করবার যো আছে তোমার জালায়? বলিয়া ফস্ ফস্ করিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢোকে।

যোগীবর আবার হাসে, বলে, হবে হবে—অত ভাবিস্ কেন?

একটু রসিকতা করিয়া আবার বলে, কিন্তু তোর সোন্দর মুখে নঁথ মানাবে রে? আমি বলি, বিছে হার একছড়া—কি বলিস্?

আগুনের তাতে চাঁপার মুখখানা টক্‌টকে রাঙ্গা দেখায়। হঠাৎ বলে, তবে তাই দিও—

সেই খুব ভাল হবে চাঁপা! যোগীবর বলে।

চাঁপা উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলে, আমায় লোভ দেখানো হচ্ছে বুঝি? যাও—বলিয়া আবার গিয়া বসিয়া পড়ে।

আপনমনে তখন যোগীবর ভাত খাইতে থাকে।

গেলবর্ষায় ভাঁড়ারের চালাটির অনেকখানি ফুটা হইয়া গেছে। সেটা না ছাহিলে আর চলেনা। পুকুর পাড়ের যেখানটা ধ্বসিয়া গেছে সেটুকু না গাঁথিয়া দিলে এবারকার বর্ষায় সব চারামাছগুলি পলাইয়া যাইবে। মতি কয়ালের কাছে তিনগণ্ডা টাকা দেনা—

ভাবিতে ভাবিতে যোগীবর রাত্রি কাটাইয়া দিল।

অন্নপ্রাশনের বিরাট উৎসব—একেবারে রাজযজ্ঞি! ভোজের মই-মাড়ন ব্যাপার। কাঙালী-ভোজন, বারোয়ারী, খেম্‌টা, পুতুল নাচ, রাতের বেলায় ভজু পাঁড়ের যাত্রা।

চাঁপা উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল। সে আর রাস্তায় বাহির হয় না। পাড়ার ছোঁড়াগুলা নাকি তাহাকে দেখিলে কানাকানি করে—শিষ দেয়। দু'চারিটা বুড়া কথা কহিবার লোভে বলে, কোন্‌দিকে যাবে বাছা?

তাহার হাসি পায়—ভারি লজ্জা করে। রাগও হয়।

পূজা-পার্ব্বণ শেষ করিয়া যখন যোগীবর ঘরে ফিরিল তখন বেলা আর নাই। চাঁপা হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল, জল খেয়ে এসেছ?

না। বলিয়া যোগীবর গামছার খুঁটে বাঁধা মিষ্টান্নগুলি একে একে মাটিতে নামাইয়া রাখিল। তারপর বাহিরের দিকে একবার ফিরিয়া বলিল, আয় রে—

যে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল সে বাবুর বাড়ীর লোক; ভিতরে আসিয়া কাঁধের বড় চেঙারি দুইটা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চাঁপা হাসিতে হাসিতে বলিল, এত জিনিষপত্তর বুঝি একলা ব'য়ে আন্‌তে পারোনি?

হুঁ—বলিয়া যোগীবর নিজের পেটের কাপড়ের একটা গিঁট খুলিতে লাগিল।

চাঁপার সে দিকে আর নজর নাই। সে তখন তাড়াতাড়ি জিনিষপত্রগুলি তাংড়াইয়া ঘরে তুলিয়া রাখিতেছিল। একবার বলিল, এর থেকে আর কাউকে ভাগ দিতে হবে না ত?

তারপর হঠাৎ—

ওমা ওটা কি গো?

যোগীবর হাঁ হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল, শালগ্রাম শিলা। শালগ্রাম! শালগ্রাম! কিনে নিয়ে এলুম—

শাল্ গেরাম্ কি? ও ত একটা নুড়ি—কত দাম নিলে? ভালমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিলে ত?

যোগীবর পাথরের নুড়িটি হাতে করিয়া একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল, তারপর সেটি একবার মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, নুড়ি? বলিয়া একটু হাসিয়া পুনরায় কহিল, এই দ্যাখো—এই যে গায়ের ওপর সাদা দাগটির নাম হচ্ছে উপবীত—এইটি দেখেই চেনা যায়—

চাঁপা বলিল, বেশ—চিনেছি। কত দাম শুনি?

পঞ্চাশ টাকা নিলে।

কত?

পঞ্চাশ টাকা গো—

চাঁপা তবু ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, পঞ্চাশ টাকা কতটি তা জান ত?

যোগীবর হাসিয়া বলিল, জানি—একশ টাকার অর্দ্ধেক।

পাওনা টাকা থেকে আন্‌লে নাকি?

নৈলে আর কোত্থেকে আন্‌ব?

কত পেয়েছিলে?

পঞ্চাশ টাকা—

চাঁপা উঠিয়া ঘরে চলিয়া গেল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার বাহিরে আসিয়া বলিল, হায় নথ কিছুই আমার হবেনা ত?

হবে বৈ কি—

কিসে হবে? আমার ছেরাদ্দ হবে—

যোগীবর কহিল, রাগ করনা চাঁপা! নারায়ণ পিত্তিষ্ঠে করি—এঁর দয়া কি হবে না? এর পর বাবুর বাড়ী আবার কত পালা-পাব্বন আসবে।

এই কথাটিতে চাঁপা সব চেয়ে বেশী রাগ করিত। সে বলিল, থাক্ আর আশা দেখাতে হবেনা। আমার কিছু চাইনি। নুড়ি এনেছ, নুড়ি নিয়েই থাকো। বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া ঘরের ভিতর গিয়া বসিয়া পড়িল। চোখে তাহার জল আসিতেছিল।

চীৎকার করিয়া পুনরায় কহিল, আমার চেয়ে তোমার ওই পাথুরে নুড়ি বড় হল? মানুষকে বঞ্চিত্ করে ওই যা-তায় যথাসব্বশ্ব দেয়া? আমায় এমন লোভ দেখাবার দরকার কি ছিল? আমি কি চেয়েছিলুম কিছু? বলিতে বলিতে তাহার গলা বুজিয়া আসিল।

খানিকক্ষণ পরে কাছে আসিয়া যোগীবর বলিল, আমার সঙ্গে কথা কইবে না?

না কইব না যাও—বলিয়া চাঁপা মুখ ঘুরাইয়া বসিল।

যোগীবর হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, তবে মান ভাঙাই?

চাঁপা ফিক্ করিয়া এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, পাঁচ সিকে দামের নুড়িটা কি বলে পঞ্চাশ টাকায় কিন্‌লে?

তারা চাইলে যে—

ওরে আমার চাওয়া! নুড়ির বদলে যদি তারা আমায় চাইত?

তাহলে? তা হলে—কি কর্ত্তুম বলতে পাচ্ছিনি—বলিয়া যোগীবর হাসিতে লাগিল।

নারায়ণ প্রতিষ্ঠা।

যোগীবর গিয়া বাবুর কাছে হাত পাতিল। বাবু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পুরুষানুক্রমে সে তাঁহাদের বাড়ীর পুরোহিত। তা ছাড়া যোগীবরকে তিনি ভালই বাসিতেন। সে বড় সরল।

বলিলেন, আচ্ছা যাও—শুধু নারায়ণ পিত্তিষ্টের খরচটা আমি দিয়ে দেবো। আর কি বলচ বল?

যোগীবর বলিল, গোঁসাই পাড়ার জ্যোতীষ ঠাকুরকে যদি একবার বলে দেন্—

পূজোটা সেরে দেবার জন্তে বুঝি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তাতে আর কি ! বলে দেবো। বলিয়া বাবু চলিয়া যাইতেছিলেন।

যোগীবর বলিল আপনি একবার যাবেন কি ?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বাবু বলিলেন, কোথায়—তোমার বাড়ীতে ?

আজ্ঞে হাঁ—

হাসিতে হাসিতে বাবু বলিলেন, মা-ঠাকরুণ নেমন্তন্ন করেছেন নাকি ?

যোগীবর মাথা হেঁট করিয়া একটু হাসিল।

বাবু বলিলেন, যাবো যাবো।

চাঁপা আবার কোমর বাঁধিল। সকাল হইতে পূজার যোগাড় রান্নাবান্না—সে যেন আর চোখে কানে পথ দেখিতেই পায় না ! বাবুর আজ আবার এখানে নিমন্ত্রণ !

মুখের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া সে আবার কাজে যায়।

যোগীবর নৈবেদ্য করিতে করিতে তাহার শ্রান্ত মুখখানির দিকে আড়ে আড়ে তাকায়। একটু একটু হাসে।

জ্যোতীষ ঠাকুর যখন আসিল তখন বেলা অনেক। বাবু আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন, বলিলেন, হারাণের এত বিলম্ব যে ?

আসনে বসিয়া হারাণ বলিল, আর বলেন কেন বাবু ! রাস্তা ঘাটে—কি আর চলবার যো আছে ? ওলাউঠোর রুগী দুটো মরে রয়েছে রাস্তায়। ফেলবার মানুষ নেই। পথে লোকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে—

কবে মরেছে ?

কাল রাত্তে। আপনার লোক বোধ হয় এতক্ষণে নিয়ে গেল—

বাবু বলিলেন, হ্যাঁ আমার ওসব ব্যবস্থা করা আছে—

আচমন করিয়া হারাণ আবার বলিল, গেল কাল সকালের ব্যাপার জানেন ত ?

কি ? বাবু বলিলেন। যোগীবর মুখ তুলিয়া চাহিল।

যদু ঘোষের ছোট ছেলেটা সোনালীতে ডুবে মারা গেল। ওহে যোগী, দেখি দেখি তোমার শালগ্রামটি—বলিয়া হারাণ হাত বাড়াইল।

যোগীবর দুধ দিয়া শালগ্রামটিকে স্নান করাইতেছিল, তাড়াতাড়ি সেটিকে নামাবলীর খুটে ভাল করিয়া মুছিয়া হারাণের হাতে দিল।

চাঁপা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ আপন মনে চুপি চুপি বলিল, সেই বিট্‌লে জ্যোতীষ ! ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাওয়া হয়েছিল ! ভালয় ভালয় এখন কাজ উদ্ধার হলে হয়—এই বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হারাণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নুড়িটিকে পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল, উঁহু—

বাবু বলিলেন, কি হে ?

না দাঁড়াও হয়েছে, কিন্তু—আচ্ছা ধর যদি—যদি কেন নিশ্চয়—তা হলে কাটবার উপায় আছে কি ? উঁহু—বলিয়া হারাণ বাবুর দিকে চাহিল।

বাবু বলিলেন, কি দেখলে ?

দেখলাম বড় অশুভ ! এ নারায়ণ যদি প্রতিষ্ঠা হয়—

হারাণের ভাবভঙ্গী দেখিয়া যোগীবরের হাত দুইটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাবু বলিলেন, তবে কি ?

যোগীর বড় মন্দ হবে।

যোগীবর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিল, তারপর কহিল, এই কথা !

দাঁড়াও, আরও আছে—বলিয়া হারাণ শালগ্রামটির দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার পত্নীর অকল্যাণ হবে—

যোগীবর আবার হাসিল। সেটা অবিশ্বাসের হাসি।

চাঁপা একবার কটমট করিয়া হারাণের দিকে চাহিয়া ভিতরে গিয়া রাঁধিতে বসিয়া গেল। চুপি চুপি বলিল, ছাই হবে, জোতীষ না ছাই, গাঁজাখোর কোথাকার !

বাবু বলিলেন, তাইত হারাণ—এসব কি বলচ ?

দাঁড়ান, বলিয়া হারাণ আর একবার নুড়িটিকে

উত্তরস্বরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, এসব ত তুচ্ছ ব্যাপার আসলটাই বলিনি—

বাবু সভয় দৃষ্টিতে চাহিলেন। যোগীবরের মুখেও আর কথা নাই।

হারাণ বলিল, এ শালগ্রাম যদি প্রতিষ্ঠা হয় তবে গাঁয়ের অতিশয় অমঙ্গল হবে। অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, জল, অগ্নি, কঠিন ব্যাধি—এসব কিছুই বাদ পড়বে না।

বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সে কি? না না তবে থাক্। এমন শালগ্রাম পিতিষ্ঠে করে কাজ নেই, বুঝলে ঠাকুর?

যোগীবর মুখ তুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল।

বাবু বলিলেন, এমন বিপদ মাথায় করে ঠাকুর বসিয়ে কাজ নেই। ঠাকুর পিতিষ্ঠে ত আর অমঙ্গলের জন্যে নয়!

যোগীবর গম্ভীর হইয়া রহিল।

হারাণ বলিল, আমি বলি এসব তুলে ফেল। কিছু পয়সার ওপর দিয়েই যাক্—

আমিও তাই বলি, জানো ঠাকুর?

গলা ঝাড়িয়া যোগীবর বলিল, আজ্ঞে না—

না কি?

ঠাকুর পিতিষ্ঠে আমি কর্ব্বই।—

সে কি! বাবু বলিলেন,—যদি গাঁয়ের অমঙ্গল হয়?

স্পষ্ট করিয়া যোগীবর বলিল, ও-কথা আমি বিশ্বাস করিনে।

বিশ্বাস করনা? তুমি বামুনের ছেলে হয়ে জ্যোতীষে বিশ্বাস করনা?

হারাণ শ্লেষের হাসি হাসিল।

আজ্ঞে না, ওসব বাজে কথা। ঠাকুর কখনও অমঙ্গল কর্ত্তে পারে না।

ধাঁ করিয়া বাবুর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, অমঙ্গল কর্ত্তে পারে না জানি, কিন্তু কাল থেকে এই যে আচম্‌কা তিন-চারটে লোক অকালে মরে গেল—এসব কি?

সে কথা জিজ্ঞেস কর্‌বাই অন্যায়—যোগীবর বলিল।

বাবু এইবার চটিয়া উঠিলেন, ন্যায় অন্যায় সেটা আমি বুঝব, তোমার তাতে দরকার কি? আমি বলচি তোমার ও-ঠাকুর পিতিষ্ঠে করা হবেনা—।

যোগীবর বলিল, মাপ করুন, আমি ও কথা শুনতে পারব না।

কি বললে?

দরজার দিকে যোগীবর চাহিয়া দেখিল, ঠিক বেতস পত্রের মত চাঁপা দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই চাঁপা মাথা চাপড়াইয়া হাত যোড় করিয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, যাতে বাবুর সঙ্গে ঝগড়া না বাধে।

বাবু আবার বলিলেন, তুমি পুরুত বলে আজ মাপ করলুম, কিছু বলতে পারলুম না। কিন্তু আমার কথা হচ্চে—তোমার ওই একরত্তি নুড়ির জন্যে গাঁয়ের এত বড় অমঙ্গল ডেকে আনতে পারব না—যে যাই বলুক। আমার কাছে ঠাকুর বড় নয়, মানুষ বড়। ঠাকুর পিতিষ্ঠে কিছুতেই হতে পারে না।—চল হে চল হারাণ—বেলা গেছে—বলিতে বলিতে তিনি হারাণের আগেই উঠিয়া গেলেন।

যাইবার সময় একবার পিছন ফিরিয়া বলিলেন, ও শালগ্রাম এ গাঁয়েই রাখা চলবে না—ব'লে দিয়ে গেলুম। কি করবে ভেবে রেখো—কাল সকালেই এর উত্তর চাই।

বলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িতেই পিছন হইতে একদল ছেলে একেবারে গেল গেল শব্দ করিয়া উঠিল।

একটা গরু তীরবেগে ছুটিয়া যাইতেছিল। সুমুখে একটা বছর দশেকের ছেলে রাস্তা পার হইয়া যাইবে—হঠাৎ গরুটা আসিয়া তাহাকে শিং দিয়া গুঁতাইয়া দিয়া আবার দৌড়িল।

ছেলেটা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ভয়ে ও আঘাতে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া গেল।

সকলে গোলমাল করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং সুমুখে স্বয়ং রাজাবাবুকে দেখিয়া অনেকেই পায়ের ধূলা লইল।

বাবু বলিলেন, গরুকে এমন করে তাড়া দিলে কে?

একটা ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল, কেউ তাড়া দেয়নি—ওই নন্দাদের গোয়ালে আগুন লেগেছে কিনা তাই—

বাবু চমকিয়া উঠিলেন। পাশেই হারাণ দাঁড়াইয়াছিল। বলিলেন, এসব কি হে?

হারাণ বলিল, শনির দৃষ্টি! জানা কথাই! ও শালগ্রাম পিতিষ্ঠে হলে কিছুই থাকবে না বাবু—

বাবু তাড়াতাড়ি গিয়া আহত ছেলেটাকে তুলিয়া ধরিলেন।

শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা হইল না।

চাঁপা বলিল, হারাণ ঠাকুর যা বলে গেল তা কি সত্যি?

ছোট্ট পিতলের সিংহাসনটিতে শালগ্রামকে রাজ-বেশে সাজাইয়া যোগীবর তাহারই পাশে বসিয়াছিল, বলিল, কি করে জানব?

চাঁপা বলিল, আমারও ওসব বিশ্বাস হয় না কিন্তু—

কি? বলিয়া যোগীবর মুখ ফিরাইল।

গাঁয়ের এমন অমঙ্গল ত একসঙ্গে কোনও দিন হয়নি—আজ দেখতে দেখতে চারদিক থেকে যেন সব বিপদ ঘনিয়ে এল। শুনচ? ওগো! আমি বলি, যার শালগ্রাম তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস—বুঝলে?

হঠাৎ যোগীবর মুখ তুলিয়া বলিল, ফিরিয়ে দিয়ে টাকাগুলো সব নিয়ে আসি—কেমন? তাহলে তোমার হার নঁথ সবই হয়?

আমি কি তাই বলচি?' বলিয়া গোঁজ্ গোঁজ্ করিতে করিতে চাঁপা উঠিয়া গেল। কথাটিতে তার রাগ হইল বটে, কিন্তু স্বামীর অকৃতকারিতার ব্যথাটাও তার বড় লাগিয়াছিল।

যোগীবর আর কিছু বলে না। চুপ করিয়া শালগ্রামটির দিকে একমনে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

বাবুর বাড়ীতে সেদিন এক বিশ্রী কাণ্ড!

বড় চালার ভিতরকার দুইটি ধানের গোলা একেবারে নিঃশেষে পুড়িয়া গেছে। অন্ধকার রাতে লোকে টেরও পায় নাই। কখন আগুন ধরিয়াছে কে জানে। চালা ঘর পুড়িবার সে কি ধূম! আগুনের শিখা রক্ত-রসনার মত আকাশের আঁধারটুকু একেবারে যেন চাটিয়া লইতে চায়।

লোক দ্বারায় বাবু যোগীবরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, শুন্‌লে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

নুড়িটা কোথায় দিয়ে এলে?

একটু ইতস্তত করিয়া যোগীবর বলিল, কোথাও দিইনি, নিজের কাছেই আছে—

সে কি! শুন্‌লে না আমার কথা?

যোগীবর চুপ করিয়া রহিল।

বাবু বলিলেন, বটে?—শোনো—তুমি ব্রাহ্মণ, আমার গুরু;—ওসব ইয়ে ছেড়ে দাও। শালগ্রামটি সোনালীর জলে ফেলে দিয়ে এস! তোমার আমি বরং তোমার বাড়ীতে ভাল করে একটি শিব মন্দির পিতিষ্ঠে করে দিই। তাহলে তোমার আর কোনই ভাবনা থাকবেনা—বুঝলে?

পরিষ্কার কণ্ঠে যোগীবর বলিল, আজ্ঞে না—তা হয় না—

হয় না? কেন হয় না শুনি? বলিতে বলিতে বাবু রাগে অধীর হইয়া উঠিলেন, তোমার মন যে কিছুতেই ওঠেনা দেখছি, তবে যা খুসী করগে। তোমার শালগ্রাম নিয়ে কালই আমার গাঁ থেকে বেরিয়ে যাও।—বুঝলে? তোমার ওই সর্ব্বনেশে নুড়ি—আমি এ গাঁয়ে কিছুতেই রাখতে পারব না।—বলিয়া তিনি উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

যোগীবর একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে যখন আসিল তখন রৌদ্রে একেবারে চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। দূরে কোথায় যেন কোন্ গাছের

ওপর একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল; আর ওই অর্জ্জুন গাছের মাথায় যেন আর একটা—।

...তাহাদের ক্লান্ত উদাস কণ্ঠস্বরে দুপুরের বাতাস যেন থম্ থম্ করিতেছে।

যোগীবর চুপ করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া রহিল। দক্ষিণের হাওয়া তখন সবে মাত্র বহিতে সুরু করিয়াছে। মেটে উঠানের দুধারে দোপাটী, কেষ্টকলি, আরাপানি, অপরাজিতা হাওয়ায় ল' ল' করিতেছে। গেল বছর যে কলমে-চারা দুইটি লাগানো হইয়াছিল, ইহারই মধ্যে সেগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। দু একটি বুলবুলি পাখী তাহাদের ডালে আসিয়া বসে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে উড়িয়া বেড়ায়।

ভিজা মাটির সোঁদালো গন্ধে চারিদিক ভরপুর!

কিন্তু কোথায় যাইবে সে?

...এই মাটি ছাড়িয়া?

রাত অনেক। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

ঘুমের ঘোরে যোগীবর উঠিয়া বসিল। নুড়িটি হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল, চাঁপা?

চাঁপা ঘুমায় নাই। শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, বলিল, কেন?

বাবুর গোলায় আবার আগুন লাগল নাকি?

আগুন—কই? দেখা যাচ্ছে নাকি? বলিয়া চাঁপা ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

যোগীবরের চোখ দুইটা তখন বড় বড় হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলে ভয় করে! বলিল, আকাশটা লাল হয়ে উঠলো যে।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। হাওয়া আসিতেছে। চাঁপা বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইল। জ্যোৎস্নায় চারিদিকে ফিন্ ফুটিতেছে। হঠাৎ সে বলিল, আকাশ আবার লাল হল কোথায় ছাই? কি দেখলে তুমি?

ও। বলিয়া যোগীবর আবার শুইয়া পড়িল।

চাঁপা বলিল, ও যে আমার রাঙা সাড়ীখানা দাওয়ায় শুকুচ্ছে—

কিন্তু যোগীবর আর উত্তর দিল না, চুপ করিয়া শাল-গ্রামটিকে হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

একটু পরে চাঁপা বলিল, বাবু আজ কি বল্লেন গা?

বললেন, গাঁ ছেড়ে যেতে হবে—

সে কি! কোথায় যাব?

তা বলেন নি—যেখানে খুসী।

কেন? আমি যাব না। বলিয়া একটু থামিয়া চাঁপা পুনরায় কহিল, আমরা যাই আর খামারের তরি-তরকারী পাঁচভূতে লুটে-পুটে নিক্। ফুলগাছ সব ছিঁড়ে নিয়ে যাক্। ভোলা হতভাগা পুকুরের চারামাছ সাবাড় করুক—কেমন? বাবু এমন কথা আর না বলেন। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

যোগীবর বলিল, তবে শালগ্রামটি সোনালীতে ফেলে দিয়ে আসি! কি বল?

চাঁপা মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা দাওগে। ও ছাইয়ের নুড়ি ঘরে রেখে ত সবই হবে। ভগবান ত আর নুড়িতে নেই, ভক্তিতেই ভগবান। আর নুড়িতে যদি এমন অমঙ্গল হবে তবে ও রাখবার দরকার কি?

নুড়িটি তখন যোগীবরের বুকের ভিতর লুকানো। সে বলিল, তবে তাই হ'ক—

সকাল বেলা কিন্তু সে বাঁকিয়া বসিল। শালগ্রাম ছাড়া সে থাকিতেই পারিবে না। সেদিনকার ঠাকুর পূজা তাহার সাঙ্গই হয় না।

চাঁপা স্বামীকে চিনিত, মনে-মনে প্রমাদ গণিল।

বাবুর বাড়ীর সরকার আসিয়া উপস্থিত। নুড়িটি লইয়া যাইতে চায়। যোগী চোখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, যাও, আগড়ের বাইরে যাও। ঠাকুর দেবো না—

তাহারা চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই বাদে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা জানাইল,

বে এক্ষুণি চলে যেতে হবে, বাবু বলে দিলেন। জিনিষ-পত্তর নিয়ে বেরোও। যেখানে খুসী। বলিয়া তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

চাঁপা ঝগড়া করিল—কান্নাকাটি করিল, কিন্তু স্বামীর সেই ধনুর্ভাঙ্গা পণ! শেষে হয়রাণ হইয়া সে বলিয়া উঠিল, তবে আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—

তাই যাও! বলিয়া যোগী বাহিরে আপনার ছোট্ট সাজানো বাগানটিতে গিয়া বসিল।

... ..ফুলগুলির উপর তখন একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছে। কলমে-চারায় বোল্ ধরিয়াছে—এবছরেই ফল ধরিবে। কেঁচোয় মাটি খুঁড়িয়া খুড়িয়া মাটির তলাকার আঁধার রাজ্যে আলো লইয়া যাইতে চায়। যোগীবর সে দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

......ও পাড়ার হরিমতিকে সঙ্গে করিয়া চাঁপা বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। জিনিষপত্র যা পারিল সঙ্গে লইল। যাইবার সময় টিপ্ টিপ্ করিয়া স্বামীর পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

বড় কান্নাটাই সে কাঁদিয়া গেল।

কাঁদুক—। দেবতার চেয়ে মানুষের কান্না ত বড় নয়।

একা—।

গায়ে নামাবলীখানা,—তার তলায় একেবারে বুকের কাছে ছোট্ট সিংহাসনে শালগ্রামটি।

গাঁ ছাড়াইয়া চলিল। চলনের বিরাম নাই।

সুমুখেই সোনালী নদী তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এপার ওপার দেখা যায় না। রোদের তাতে চরের বালি চিক্‌চিক্ করে।

খেয়া-নৌকায় যোগীবর পার হইল।

এপারেও বিশাল বালুচর। চলিতে পা ডাবিয়া যায়। রোদের তাতে বালি একেবারে আগুন। যেন মরুভূমি। তীরের দিকে নজর চলে না।

ওপারে গাছের কালো রেখা দেখা যায়।

যোগীবর চলে। চলে আর নামাবলীর ভিতর তাকায়। আবার চলে।

......কতকগুলা স্ত্রীপুরুষ বালির ঝোড়া মাথায় লইয়া গান করিতে করিতে চলিয়া যায়। কয়েকটা ছেলেমেয়ে বালির মুঠি লইয়া খেলা করে।

যোগীবর চাহিয়া চাহিয়া দেখে। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া ওঠে।—কিন্তু বালি ভাঙ্গিয়া আবার সে চলিতে থাকে।

ক্রমে তীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বাবলা গাছের সারি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। উঁচু পাড়ের উপর খান কয়েক গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে। তাহার গোড়াতেই একখানা বড় নৌকা উবুড় করা। বোধ করি মেরামত হইবে।

যোগীবর তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিল। গায়ে ঘাম দিয়াছে।

গাছের ছায়া আছে, কিন্তু পথ নাই। ডিঙ্গাইয়া মাড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে হয়। পায়ে কাঁটা ফোটে। গা ছড়িয়া যায়।

ডোরা-কাটা কাঠবেড়ালিগুলা সুমুখ দিয়া ছুটিয়া গাছের গুঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়া ওঠে। চিড়িক্ চিড়িক্ করিয়া ডাকে। বুনো শালিকের মদিরকণ্ঠ ছায়াময় গভীর নির্জ্জনতায় চমক লাগায়।

দিনের বেলায় শেয়াল দৌড়াইয়া যায়। উলুখড়ের গোড়ায় গোড়ায় সর্ সর্ করিয়া শব্দ হয়।

যোগীবর চলে। নামাবলীর তলায় শালগ্রামটি তেম্‌নি থাকে।

সন্ধ্যা হয়। অবসান বেলার শেষ আলোটুকু বাব্‌লাবনের মাথায় ম্লান হইয়া যায়।

বন ছাড়াইয়া যোগীবর মাঠে পড়িল। মাঠটার

পরিসর বড় ছোট। অস্পষ্ট অন্ধকারে পথের উপর একটা শকুনি বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ডানা তুলিয়া সরিয়া গেল। হাড়ের গন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ।

দূরে একটা টিম্‌টিমে আলো দেখা যাইতেছিল। যোগীবর তাহার কাছে আসিতেই পিছন হইতে শব্দ আসিল, কে গা ?

ফিরিয়া চাহিল। অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখিল একটি ছোট্ট মেয়ে। অসামান্য রূপ! কণ্ঠস্বর যেন বাঁশী!

কি চাও ঠাকুর ?

গলা ঝাড়িয়া যোগীবর বলিল, কোথায় থাকো তুমি মা ?

ওই যে ঘর। বাবা আছে যাও। আমিও যাচ্ছি। মেয়েটি বলিল।

যোগীবর আস্তে আস্তে গিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির দাওয়ায় দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

মেয়েটি তখনই আসিয়া পড়িল। বলিল, এসো ঠাকুর! ভেতরে এস! বাবাকে খুঁজছ বুঝি ? বলিয়া পথ দেখাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

ভিতরে উঁকি মারিয়া যোগীবর দেখিল, পিছন ফিরিয়া একটা অতিকায় লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খড়ি দিয়া দেয়ালে কি আঁক কাটিতেছে। কেশবিরল মাথাটি তার প্রায় চালায় ঠেকিয়াছে। দেখিলে ভয় করে।

মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, কে রে মাণিক ?

যোগীবর কাতর কণ্ঠে বলিল, বাবা—

কি চাও ?

একটু আশ্রয় বাবা—রাতটার জন্যে—

ও। বলিয়া সে আবার দেয়ালে কি আঁক কাটিল। তারপর বলিল, গজু আমার নাম। উটি মেয়ে। ওটা কি তোমার হাতে কাপড়ের তলায় ? দেখি।

যোগীবরের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, ও কিছু না বাবা, উটি বড় দামী জিনিষ। ওইটে নিয়ে বিপদে পড়েছি বাবা—

দেখি না ?

না বাবা মাপ কর। তবে না হয় আসি।

আচ্ছা থাক্ থাক্। বলিয়া গজু একটু হাসিল। তারপর ওই গুপ্ত ধনটির প্রতি একবার আড়চোখে চাহিয়া বলিল, খাবে নাকি ঠাকুর ?

খাবো ? বলিয়া যোগীবর একটি ঢোক গিলিয়া পুনরায় কহিল, তা যদি একান্ত না ছাড় বাবা, কি আর করব। এঁটো হাত একমুঠো—

গজু বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের শব্দে ঘরখানা ঠিক থম্ থম্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মাণিক সরিয়া আসিয়া বলিল, ঠাকুর ওটা কি ?

ব্যস্ত হইয়া যোগীবর বলিল, এ কিছু নয় মা—

দেখি—

যোগী মহা বিপদে পড়িল। বাপকে পাছে বলিয়া দেয় এজন্য ভয়ে ভয়ে বলিল, না মা ও দেখতে নেই। দেখলে লোকে কালো হয়ে যায়।

কালো হয়! ধ্যেৎ, দেখাও না তুমি! আমি নেবো না!

তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া যোগী বলিল, ছি মা, বুড়ো বামুনের অবাধ্য হতে নেই। আচ্ছা উনি তোমার বাবা না ?

হুঁ।

মা নেই ?

মা ?—না ত'।

উনি কি করেন ?

মাণিক হাসিল। হাসিয়া বলিল, লাঠি দিয়ে লোকদের মারে। আর তাদের টাকা কেড়ে নেয়।

যোগীবর শিহরিয়া উঠিল, সত্যি!

সত্যি; তুমিও থাকো দেখতে পাবে। আগে তোমার ঐটে দেখাও, নৈলে রাতের বেলায় তোমাকেও—

গজু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নিজেই রাঁধবে ঠাকুর ?

যোগী তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, বলিল, হাঁ বাবা, তোমার আর কষ্ট করে—হেঁ হেঁ—মাণিক মেয়েটি

বড় ভাল—হেঁ হেঁ—তোমার অসুখ করেছে বুঝি বাবা? আহা খাটুনির শরীর—

কিন্তু কাঁপুনি আর থামে না,—যেন পরের দেহ।

গজ্জু হাসিয়া বলিল, যাও ঠাকুর উপোস করে আছ, রাঁধগে যাও।

এই যে যাই বাবা। উঃ! হাওয়াটি বড় গরম তোমার এখানে বাবা। আর নয়ত আমি অনেক হেটেছি কি না তাই ঘাম হচ্ছে—হেঁ হেঁ—বলিতে বলিতে যোগীবর মাতালের মত পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ভোজন হইল ভরপুর, কিন্তু চোখের পাতাটি বুজিতে চায় না। মাঝে মাঝে আচমকা তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। আগড়ের দিকে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে এক একবার চাহিয়া দেখে।

আগড়ে হুড়কো নাই।

তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে আবার তন্দ্রা আসে।

হঠাৎ আগড় ঠেলিয়া মাণিক ঘরে ঢুকিল। যোগীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিয়া আবার থামিয়া গেল। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, তোমার বাবা ঘুমিয়েছেন? না মা?

মাণিক বলিল, হুঁ—বাবা সন্ধ্যে থেকে ঘুমোয়, অনেক রাতে আবার বেরিয়ে যায়। বলিয়া কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর—

এমন সুন্দর মেয়ে যোগী জীবনে দেখে নাই। মৃদু আলোকে তাহার চপল চাহনি ঘরের ভিতর মায়া সৃষ্টি করে। তাহার কোঁকড়ানো চুলের ভিতর হাত বুলাইয়া যোগীবর বলিল, কি মা?

তোমার কাপড়ের ভেতর ওটা কি দেখাবে? কাউকে বলব না—

পাশের ঘরে গজ্জু ঘুমাইয়া ভস্ ভস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। যোগীবর সেদিকে একবার চাহিল, তারপর মাণিকের সুকোমল দেহটি কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, তোমার বাবাকেও বলবেনা?

না, আগে দেখাও—

যোগীবর সিংহাসনটি বাহির করিল। সেটি যেন হীরার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। শালগ্রামটি তাহার উপর যেন পরম তৃপ্তিতে বসিয়া আছে।

দেখিবামাত্র মাণিক বলিল, ওটি আমায় দাও না ঠাকুর!

ছি পাগলি মা, ও কথা বলতে নেই!

দেবে না? মাণিক বলিল।

যোগী সভয়ে বলিল, রক্ষে কর্ মা—ওকথা বলিসনি—

তবে গল্প বল। বলিয়া মাণিক তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইল।

শালগ্রামটি তেমনি সাবধানে রাখিয়া তাহারই কাছে শুইয়া পড়িয়া যোগী বলিল, কি গল্প বলব?

বল না তুমি—

যোগী বলিল, এক বামুন আর এক বামনি। বড় গরীব।...

ওটা না,—ওটা না। সেই রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে—সেইটে বল—

যোগীবর বানাইয়া বানাইয়া রাজপুত্রের গল্প বলিতে লাগিল। একটু পরে ফিরিয়া দেখিল, ইহারই মধ্যে মাণিক কখন অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সেও বেশ একটু সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে চোখ দুটি বুজিল।

সকাল বেলা গজ্জু বাহির হইয়া যাইতেছিল। একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, উরির জন্ত ভয় পাচ্ছিলে ঠাকুর?

যোগীবর মুখ তুলিয়া চাহিল।

ওই তোমার সম্পত্তিটি?—রাতের বেলা গিয়ে দেখেছি, কিছুই নয় ওটা—

হাঁ করিয়া যোগী চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতেই পারিলনা রাত্রে কখন্ তাহার সম্পত্তিটি গজ্জু দেখিয়া আসিয়াছে—। একটুপরে হঠাৎ বলিল, পেত্তলের বাবা,

—ও পেন্তলের—। গরীব বামুন, সোণা কোথায় পাব বাবা ?

গজু আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, পুজো কর্ত্তে—জানো ঠাকুর—?

জানি বৈকি বাবা— ওই ত কাজ—

তবে এইদিকে যাও, পো-তিনেক রাস্তা। গাঁ পেরোলেই রাজবাড়ী পাবে—। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

যাইবার সময় মাণিক বলিল, ওটা আমায় দিলেনা ? দাও ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, দাও—

না মা, এ নিতে নেই মা আমার! এ ঠাকুরের জিনিষ—

তবে আমায় কোলে নাও—।

যোগীবর কোলেও নিলনা। চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

অনেকদূর গিয়া সে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, মাণিক তাহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই মেয়েটা মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল।

আবার যায়। পথের কোনও ঠিকই নাই।

তিন-পো রাস্তা আর ফুরায় না। মাথার উপর রোদ উঠিল।

তিন প্রহর বেলা। তৃষ্ণাও লাগিয়াছে।

অনেকদূর আসিয়া গাঁ মিলিল। চাষারা লাঙ্গল কাঁধে করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। হাতে হুঁকা, গায়ে মাটির দাগ।

কোথা যাবে ঠাকুর ? একজন বলিল।

রাজবাড়ী বাবা। কোন্ দিকে যাবো ?

ওই যে! গোলদিঘীর ওপারে—রাজার বাগান পাবে। রাজা নয় ওরা জমীদার। যাও—এইদিকে—বলিতে বলিতে তাহারা আবার গান ধরিয়া চলিয়া গেল।

বাগান পার হইয়া জমিদারের বাড়ী। প্রকা[ণ্ড] দরজা। লোকজন, হাঁকডাক—একেবারে হৈ [হৈ] ব্যাপার।

সরকার বলিল, কি চাও ঠাকুর ?

যোগীবর বলিল, একটু কাজ চাই বাবা। পুজো কর্ত্তে জানি। শালগ্রাম সঙ্গেই আছে—

ও। আচ্ছা এস। বলিয়া সে পায়ের ধূলা লইয়া পুনরায় কহিল, যাও ওইদিকে অতিথ্‌শালা। থাকো গিয়ে —কাল থেকে কাজ পাবে।

রসময় ভট্টচায্যি বলিল, পুজুরির আর দরকার কি একজন রইছি আর কেন ? বলিয়া সে আড়চোখে যোগী[বরের] দিকে তাকাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

আশ্রয় মিলিল। কাজও পাইল।

দুবেলা রাজভোগ। যোগীবরের দিন বড় আরামে কাটে। মন্দিরের পাশেই ঘরখানি—সেইটিতে থাকে দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া হাওয়া আসে।

মন্দিরের শিব আর নিজের শালগ্রাম! দুই পূজা দিন কাটিয়া যায়।

শিবের গায়ে অনেক গহনা। সোনার তাজ, রূপার সাজ, রূপার বাসন, মুক্তার ঝালর—কপালে হীরা বসান আরও কত কি—যোগীবর তাদের নাম শোনে নাই।

রাতের বেলায় প্রদীপের আলোয় সেগুলি ঝলমল করে।

নিজের শালগ্রামটির দিকে যোগীবর চায়। পিতলের সিংহাসনটি ম্যাট্‌ম্যাট্ করে। জেল্লা তাহার কমিয়া গেছে মনে হয়।

কিন্তু পূজা করে সে একমনে। চোখ দিয়া নিঃশব্দে ধারা গড়ায়। তাহার পূজা দেখিয়া বাবুর মন বড় সন্তুষ্ট।

যোগীবর দেশের কথা ভাবে। নিজের মাটির ঘরখানি। ঘুঘুর ডাক, চাঁপার চোখের জল, ফলফুলের ছোট বাগানটুকু—

ভাবিতে ভাবিতে চোখে জল আসে।

দিন যায়।

হঠাৎ সেদিন শিবের গয়না চুরি হইয়া গেল। সোনা রূপার সাজ, মণি মুক্তা এমন কি হীরার টিপ্‌টি পর্য্যন্ত।

লোকজনদের চীৎকারে যোগীবর একেবারে দিশে-হারা!

বলিল, সেকি? গেল কোথা?

বাবু বলিলেন, কোথায় তা তুমিই জানো।

চুপ করিয়া যোগীবর নগ্নদেহ-শিবটির পানে চাহিয়া রহিল।

রসময় ভটচায্ পুরাতন পুরোহিত। সে বলিল, বলেছিলাম বাবু আপনাকে! অজ্ঞাত কুলশিলস্ত বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ! হতেই হবে বাবা—শাস্ত্রের বচন—বলিতে বলিতে আড়চোখে একবার যোগীবরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

সদর কাছারীতে যোগীবরের বিচার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল—পঁচিশ ঘা বেত।

রসময় ভটচায নিতাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, অত কমে হবে না নিতাই। চব্বিশ ঘা বেত মেরে' ভুলে গিয়ে আবার আরম্ভ করবি—

যোগীবর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

রক্তাক্ত দেহে যখন সে আপনার ঘরটিতে আসিয়া ছটফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

হঠাৎ মনে হইল, আজ ত শালগ্রামের পূজা হয় নাই!—সারাটি দিন যে উপবাসী আছে!......তাড়াতাড়ি কাপড়খানি ছাড়িয়া ফেলিয়া সে আর একখানি কাপড় পরিল। নামাবলীখানা কাঁধে ফেলিল।

পূজার সরঞ্জম সবই প্রস্তুত।

গায়ে হাতে, পিঠে, তখনও রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

মন্ত্রপূত এক একটি ফুল শালগ্রামের মাথায় উপর পড়িতে লাগিল। কিন্তু ফুলগুলি তখন রক্তে আর চোখের জ'লে একেবারে মাখামাখি। অন্ধকারে যোগীবর দেখিতে পাইল না।

পূজা শেষ করিয়া সিংহাসনশুদ্ধ শালগ্রামটি আবার কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া সে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

নামাবলীখানা রক্তে ভিজিয়া গেছে।

আবার সেই পথ।

কিন্তু অন্ধকার রাতে কোনও পথই আর নজরে পড়েনা।

তবু যাইতেই হইবে।

আকাশে চাঁদের তলায় তলায় তখন মেঘের সারি উড়িয়া চলিয়াছে। কোথায় কে জানে—

গভীর বন। রাতে বাঘ ডাকে। সাপ বাহির হয় কিন্তু যোগীবরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। চলিয়াছে ত চলিয়াছেই।

কিন্তু পথ সে হারায় নাই। চলিতে চলিতে হঠাৎ সেই হাড়ের দুর্গন্ধ নাকে আসিল। জায়গাটা চিনিতে পারিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

আকাশ তখন মেঘে মেঘে ভরিয়া উঠিয়াছে। চাঁদের আলো আর দেখা যায় না। অনেকদূরে আর্ত্তকণ্ঠে একটা নীড়হারা পাখী চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।

অন্ধকারে তাকাইয়া সে গজ্জুর ঘরখানি চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া গিয়া উঁকি মারিল।

ঘরে কেউ নাই। জানলা দরজা খোলা—জিনিষপত্র কিছুই নাই। ঘর দো'র খাঁ খাঁ করিতেছে।

চুপ করিয়া সে খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে নামাবলীর ভিতর হইতে সিংহাসনটি বাহির করিল, পরে শালগ্রামটিকে তুলিয়া মুঠার মধ্যে

চাপিয়া ধরিয়া সিংহাসনটি দুয়ারের কাছে রাখিয়া নামিয়া আসিল।

মুমুখে সেই বাবলা বন। কিন্তু চোখের জলে সে তখন একেবারে অন্ধ হইয়া গেছে।

সোনালী পার হইয়া যখন সে তীরে নামিল তখন রাত শেষ হইয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে।

জলের পাতার ধারে একবার খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। গায়ের ক্ষতে হাওয়া লাগিয়া অধিক যন্ত্রণা হইতেছিল। শালগ্রামটি তখনও তাহার হাতের মুঠার মধ্যে।

মাথার উপর দপ্ দপ্ করিয়া শুকতারা জ্বলিতেছে। সে একবার সেদিকে চাহিল, তারপর শালগ্রামটি চোখের সুমুখে ধরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, এ কি কল্লি?

অস্পষ্ট অন্ধকারে তাহার রক্তবর্ণ চোখ দুইটা ঠিক সাপের মত জ্বলিতেছিল। আবার বলিল, রক্ত দিয়েছি তা জানিস? যা দূর হ'! বলিয়া ছুড়িয়া শালগ্রামটিকে সে সোনালীর জলে ফেলিয়া দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

গ্রামে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখনও সকাল হয় নাই। জল, মাটি, গাছ, আকাশ তখনও ঝাপসা। কোথায় কোন্ গাছে একটা কোকিল ডাকিতেছে।

এই মাটি সে ছাড়িয়া গিয়াছিল।

আপনার ঘরখানি সে সহসা চিনিতে পারিলনা। ঘরের চাল একেবারে পুড়িয়া আঙার। পোড়া বাঁশ, বাঁকারি, খুঁটি সব কাৎ হইয়া আছে। মেটে রোয়াক ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। গাছগুলি আগুনের তাতে ঝল্‌সিয়া গেছে। ফুলগাছ কুঁকড়াইয়া আছে।

চারিদিক একেবারে ছন্নছাড়া!

সেই খানেই মাটিতে সে বসিয়া পড়িল। চোখ দিয়া তখন নিঃশব্দে জল গড়াইয়া আসিয়াছে।—

বন্ধুর উদ্দেশে

হাফেজ

সুরা বিতরণের ভার যখন তুমি নিয়েছ বন্ধু,—দাও, আরো ঢালো, পাত্র আমার উপচে উঠুক!

আচার্য্যের আদেশ যদি পাও,—ভয় কি, পূজার আসন মদের রঙেই না হয় রাঙা হয়ে উঠুক্! পথ ত আমার জানা আছে, মুসাফেরখানার রাস্তাগুলোও চিনি অন্ততঃ।

ওই ত' বাজে—গাঁঠ্‌রি তোলবার ঘণ্টা বাজে!...বন্ধুর কাছে আর কেমন করে' থাকি বল?

তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি। নদীটিও বড় ভীষণ! আবর্ত্তসঙ্কুল এই নদীর তীরে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় ত' তাঁদের বোঝা নেই,—আমার অবস্থা তাঁরা জানবেন কেমন করে'?

স্বার্থপর বলে' ভারি একটা বদনাম রটেছে আমার। এই নিয়ে অনেক কানাঘুষো চলে। তা চলুক্! ভয় কি! গোপন ত' আমার কিছুই নেই!

তুমি যদি তাঁর সঙ্গ চাও হাফেজ, তবে আর লুকিয়ো না। ভালবাসার ধন যখন তোমার মিলবে,—ঝুটা এই সংসারটাকে তখন ছেড়েই বা দিলে!

স্বপ্ন যখন হঠাৎ সত্য হয়—

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

বোস্‌ ও সান্ত্বনা যখন মোটরে উঠিল, তখন রায়ের রূপদর্শনক্ষুধা মিটে নাই।—

রায় পার্টি সুরু করিয়াছিলেন সান্ত্বনার মুখের দিকে চাহিয়া, শেষ করিলেনও সেইভাবেই......

আরও একবার তৃষ্ণাতুর ব্যাকুল দৃষ্টি সান্ত্বনার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া তার পূর্ণবিকশিত নিটোল দেহের উপর দিয়া বুলাইয়া লইয়া গেলেন—

একটা নিঃশ্বাসও বোধ করি চাপিয়া ফেলিলেন—

সান্ত্বনা বিদায়-সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেল সেই দৃষ্টিরই দুঃশীলতায়।... ..

বয়স হিসাবে সান্ত্বনা যৌবনোত্তীর্ণা, কিন্তু লাবণ্য হিসাবে সে যুবতী। মিসেস্‌ রায় ধনীগৃহিণী। তিনি ঈশ্বরদত্ত কৃপণ রূপ পতিদত্ত সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া রাখিতেন; কিন্তু সব কৃত্রিম জিনিষের মতই তাঁহার নিজেকে সাজাইবার ফলও কোনোদিনই হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।—

আজকার সন্ধ্যাটা মাটি করিলেন তাঁহারাই স্বামীস্ত্রীতে একজন অশোভন অলঙ্কারের ছটা আর একজন কুরুচির বিষ ছড়াইয়া।......

দুর্বিনীত ক্ষুধিত কুদৃষ্টির তাড়নায় অস্থির হইয়া সান্ত্বনা এক মুহূর্ত্তও সহজ স্বস্তির সঙ্গে মন খুলিতে পায় নাই; উপস্থিত অপর সকলেও তাহা লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে আভাসে তাহাকে ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এতক্ষণ সান্ত্বনা প্রাণপণ চেষ্টায় কোনো প্রকারে আত্মস্থ ছিল; কিন্তু মোটর ছাড়িয়া দিতেই সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।—

এই পার্টিতে সস্ত্রীক আনার মধ্যে নীহার বোসের স্বার্থের একটা নিবিড় গন্ধ ছিল।—রায় ব্যবসায় শিখরদেশে উঠিয়া গেছে, নীহার সবে আগন্তুক, এবং তাহারও ঐ শিখরই লক্ষ্য—

রায়ের সন্তোষ সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার সোপান।

আর এতকথা নীহার জানিতও না। ব্যবসাক্ষেত্রে মেলামেশায় যেটুকু ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হইয়াছে তার স্বল্প পরিসরের মধ্য দিয়া রায়ের চরিত্রের সর্ব্বদিক্‌ প্রকট হইয়া উঠে নাই। আজ বিশেষ করিয়া সান্ত্বনার সম্পর্কে রায় যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা যেমন কদর্য্য তেম্‌নি অপ্রত্যাশিত।

সান্ত্বনা সমস্ত দোষ স্বামীর স্কন্ধে চাপাইয়া অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল।...স্বামী কেন অকারণে তাহাকে এমন নির্ম্মম অপমানের মধ্যে লইয়া ফেলিবেন?

এদিকে নীহারও রায়ের দুর্ব্ব্যবহারজনিত ক্ষোভ রোষের ঝাল ঝাড়িতে লাগিল নিরপরাধিনী সান্ত্বনারই উপর—

সুতরাং ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না।

কিছুক্ষণ গোম্‌রা মুখে বসিয়া থাকিয়া নীহার স্থগিত প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া বলিল,—তোমার সব অভিযোগই মেনে নিলাম, কিন্তু তুমি একটু শিষ্টতার পরিচয় দিতে পার্‌তে যদি ঠিক মোমের পুতুলটির মত দাঁড়িয়ে না থেকে রায়ের সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্ত্তা কইতে; তাতেই সে চাপা পড়ে যেত—

সান্ত্বনা রুমালে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—কইনি? তার চাউনি যদি তুমি দেখতে!—বন্ধুভাবের মেলামেশাকে সে কি অবজ্ঞা করে গ্রহণ করেছে তা কি তুমিও দেখনি?

নীহার দেখিয়াছে সবই, কিন্তু—

হঠাৎ তর্কের মুখে আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। নীহার বলিল,—যা-ই বল তোমার কথাবার্ত্তাও ঠিক সামাজিক হয় নি। বিশেষ আমার হজ্‌মি শক্তির কথাটা আমাকে মনে করিয়ে না দিলেই সুবুদ্ধি সুরুচির পরিচয় দে'য়া হত।

সান্ত্বনা কহিল,—তা জানি, তোমারই ভালর জন্যে বাধ্য হয়ে ঐ কাজটি আমায় করতে হয়েছিল। সে দিন পেট গরম হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে আমাকেও ভয়ে মেরেছিলে।

—আমি ত খোকাটি নই, আমার তা মনে ছিল। তোমার কথাটাতে অত লোকের সামনে কতটা চক্ষুলজ্জায় পড়তে হয়েছিল তা জানো?

—সেটাও কি আমারই দোষ যে রায় সামান্য সেই কথাটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছিল?

—তুমি সেই ইতরটাকে সুযোগ দিয়েছিলে।

—সুখী হলাম শুনে যে তুমি স্বীকার করছ সে ইতর। আমি ভাবছিলাম, তোমার সে আক্কেলটুকুও লোপ পেয়ে গেছে। বলিয়া সান্ত্বনা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিল।—

মানুষের আক্কেলের জ্ঞানটা চড়ান তারের মত উগ্র সূক্ষ্ম অসহিষ্ণু বস্তু—বিদ্রূপের স্পর্শমাত্রেই সে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাজিয়া ওঠে। মানুষের জ্ঞান থাকে না, নীহারেরও রহিল না—

সে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,—আছে, আক্কেল আমার আছে; কিন্তু এটা ত সম্ভব নয় যে, কাজের খাতিরে আমায় যার সংস্রবে আস্‌তে হবে সেই তোমার নিখুঁৎ নির্লজ্জ ভদ্রলোকটি হবে। এটা তোমার জানা উচিত যে ঘরের কোণে ঘোম্‌টা টেনে হেঁসেল আগলানো জীবনের সবখানি নয়।—যাক্। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করনি।......স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সুধু শয্যাবিলাসে দাঁড়ায় এ আমি চাই না। বলিয়া নীহার থামিল।—

কিন্তু অপার বিস্ময়ে ব্যথায় ধিক্কারে সান্ত্বনা একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল......

নিরতিশয় যন্ত্রণার সহিত এই কথাটিই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ নির্ম্মূল হইয়া গেছে......পৃথিবীতে সে একা......

পরপুরুষের প্রকাশ্য লালসার সম্মুখে নারীহৃদয় যে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার দাহ সহ্য করে স্বামী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না—ইহা মনে হয় না।—সর্ব্বক্ষণ ব্যাপিয়া তাহার নিজেকে যেরূপ অপমানিত অসহায় হীন মনে হইয়াছিল তাহার সত্যকার রূপ মনে করিতেও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে—

তাহা যেমন অনির্ব্বচনীয় তেমনি কঠোর—

এবং তাহা লক্ষ্য না করাও অপরের পক্ষে ঠিক্ তেম্‌নি অসম্ভব।......

স্বামী হইয়া স্ত্রীর অপমান-যন্ত্রণা অকাতরে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র স্বার্থের দিক্‌টাই অক্ষুণ্ণ রাখিবার তাহার এই কলুষিত প্রবৃত্তি সান্ত্বনাকে বীতস্পৃহ শুষ্ক করিয়া তুলিল......

সোজা সম্মুখের দিকে চাহিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, চোখ দুটা তার জ্বালা করিতে লাগিল।—

কিন্তু প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিলে ত' চলিবে না—

স্বামীকে বুঝাইয়া দিতেই হইবে যে যথার্থই সে স্ত্রী, শয্যাসঙ্গিনী মাত্র নহে।......

কিন্তু নীহারের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উচ্চারিত অপ্রত্যাশিত রূঢ়বাক্যগুলি তাহাকে যেন দিক্‌ভ্রান্ত করিয়া গেছে—

বুঝাইবার ভাষাটা তার মনের মধ্যে তীব্রবেগে আলোড়িত হইতে লাগিল......

পথ পাইয়া বাহিরে আসিতে পারিল না।

হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরাইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই সান্ত্বনার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল নামিয়া আসিল।......

গাড়ী আসিয়া যখন বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল তখনও সান্ত্বনার চোখের জল নিবারিত হয় নাই।

এই তাহাদের প্রথম কলহ।—

সান্ত্বনা নীরবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শুইতে গেল। নীহার শয্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিল......

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যাপারটা পুনর্ব্বার আগাগোড়া চিন্তা করিতে যাইয়া এতক্ষণ যাহা তুচ্ছ কারণে সান্ত্বনার বাড়াবাড়ি দুঃখ বলিয়া নীহারের মনে হইতেছিল হঠাৎ তাহা আর তুচ্ছ রহিল না।—

সত্যই ত' সে অপরাধী।......

সকল দুঃখ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্ত্রীকে আত্ম-সম্মান রক্ষায় সহায়তা করা ত' তাহার কর্ত্তব্য।—সে তাহা করে নাই; উপরন্তু, অপমান কেন সান্ত্বনা অকাতরে নিঃশব্দে সহ্য করে নাই এই নিতান্ত অন্যায় আবদার করিয়া তাহাকে সে কঠিন গর্হিত বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনায় বিঁধিয়াছে।......

শিয়রে বাতি ছিল, সেটা জ্বালিয়া নীহার দেখিল সান্ত্বনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।......তাহার নিষ্কম্প মধুর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীহারের অন্তর অনুশোচনায় পুড়িতে লাগিল।......অথণ্ড কায় মন ও বাক্য দিয়া যে তাহাকে এম্নি করিয়া একান্তভাবে বরণ করিয়াছে, কায় মন ও বাক্য দ্বারা তাহার সেই পবিত্র আত্মসমর্পণের মর্য্যাদা ত' সে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে নাই।......

নীহারের লোভ হইল, সান্ত্বনাকে জাগাইয়া ক্ষমা চায়।

কিন্তু সান্ত্বনার ক্লান্ত অবসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সে নিবৃত্ত হইল।......অপূর্ব্ব মমতার সহিত অতিশয় সন্তর্পণে সান্ত্বনার পাণ্ডুর গণ্ডস্থলে অশ্রুচিহ্নের উপর নিবিড় একটি চুম্বন রাখিয়া নীহার বাতি নিবাইয়া দিল।—সান্ত্বনা ঘুমের ঘোরেই একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল।

নীহার ভাবিতে লাগিল,—এত নিরুপায়, অসহায়, ভীরু, দুর্ব্বল, পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী ভগবান ইহাদের কেন করিয়াছেন?......করুণায় তাহার সারা প্রাণ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

* * *

ঘুমাইয়া পড়িবার কতক্ষণ পরে তাহার ঠিক নাই—বোধ হয় দু'চার মিনিট্‌ পরেই, নীহারের ঘুমের ঘোরেই মনে হইল, ঘরের ভিতর কে যেন আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মগ্ন চেতনায় এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, যে আসিয়াছে সে শত্রু।......চতুর্দ্দিকে অফুরন্ত অটল জমাট্‌ অন্ধকার......ঘূর্ণীবায়ু সঞ্চালিত বালির স্তম্ভের মত অন্ধকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাষাণের মত নিরেট্‌ হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল......নিঃশ্বাস কষ্টকর এবং বোধশক্তি অসাড় হইয়া গেল।......

অল্পে অল্পে তার বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি সতেজ হইয়া উঠিতে লাগিল—প্রাণ বিপন্ন।......দুঃসহ ত্রাসে তাহার মননশক্তি বিকল হইয়া মস্তিষ্ক জুড়িয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু প্রবলতম চেষ্টা সত্ত্বেও হাত পা নড়িতে চাহিল না।......হিংস্র শত্রুকে তাড়াইতে হইবে—শত্রু মুখের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, তার মুখে তীক্ষ্ণ ক্রূর হাসি, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্বক্‌ ভেদ করিতেছে......মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া হঠাৎ একটা প্রাণপণ অমানুষিক উদ্যমের ফলে অতল অসাড়তা ভাঙ্গিয়া নীহারের হাত দুখানা ছুটিয়া আসিয়া শত্রুর টুঁটি চাপিয়া ধরিল।......একটা তীক্ষ্ণ স্বরক্ষীণ আর্ত্তনাদ তাহার অজ্ঞানের কঠিনতম তমিস্রা যেন ভেদ করিল......কি

একটা পদার্থ তার মুখের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াই উঠিয়া গেল।…সেই শব্দে ও আঘাতে তাহার নিদ্রা তরল হইয়া দুই বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর শক্তি সঞ্চারিত হইল।—

শত্রু যে সান্ত্বনাকেও আক্রমণ করিয়াছে……

আর্তস্বর তারই……

সেই ছট্‌ফট্‌ করিতেছে……

ক্রোধক্ষিপ্ত নীহারের অঙ্গুলিগুলি লৌহশলাকার মত পরাস্ত শত্রুর কণ্ঠের মাংসের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া গেল……

কিছুক্ষণ আঙুল চাপিয়া রাখিয়া দুইবার ঝাঁকি দিয়া নীহার তাহাকে ছাড়িয়া দিল।—

শত্রুর আর্তনাদে এবং মুখের উপর অদৃশ্য পদার্থের আঘাতে নীহারের নিদ্রা তরল হইয়া চৈতন্য ফিরিতেছিল।—

নিদ্রা যখন সম্পূর্ণ ভাঙিল তখন সে অন্ধকার শূন্যের মধ্যে নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া হাঁপাইতেছে।…… কক্ষ শব্দশূন্য নিস্তব্ধ—

তাহার নিজেরই পরিশ্রান্ত নিঃশ্বাসের ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নাই।…………

দুঃস্বপ্ন আবার আসিয়াছিল ?——

মনে পড়িতেই নীহার আপনমনে একটু সকৌতুক ক্ষীণ হাসি হাসিল।………

এই দুঃস্বপ্নকে ভিত্তি করিয়া কতবড় একটা কলহই না ঘটিয়া গেছে!………সান্ত্বনা ত তাহাকে সাবধান করিয়াই দিয়াছিল! বিনা অপরাধে কল্যাণপ্রার্থিনীকে কত অপ্রীতিকর নিষ্করুণ কথাই না সে শুনাইয়াছে! ………সকাল বেলা যখন কলহের স্মৃতি থাকিবে না তখন সান্ত্বনা এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া ভয় পাইয়া কত কীর্তিই না করিবে!……

—সান্ত্বনা?—

প্রত্যুত্তর আসিল না।

সান্ত্বনার ঘুম ভাঙে নাই; কিন্তু মনে পড়ে যেন সে কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও একবার চীৎকার করিয়াছিল। অভিমান এখনো ভাঙে নাই, কথা কহিবে না?—

নীহার পাশ ফিরিয়া সান্ত্বনাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল,—"সান্ত্বনা আমায় ক্ষমা কর"—আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই বাকি কথাগুলি তার কম্পিত ওষ্ঠাধরের উপর জমিয়া উঠিয়া নিশ্চল হইয়া গেল………

উচ্চারিত হইল না।—

………সান্ত্বনার দেহের স্পর্শ উষ্ণ তবু কেন নির্জীব?………

একটা অচিন্তনীয় ভয়ঙ্কর সন্দেহে শিহরিয়া উঠিয়া যে-ভয় অকস্মাৎ তাহাকে পাইয়া বসিল তাহা সেই দুঃস্বপ্নের শত্রুভীতির চেয়ে বহুগুণে প্রবল।………… অন্ধকারের মধ্যে অতি তীব্র আকস্মিক ত্রাসে নীহারের বুক হিম হইয়া স্পন্দন অসহ্য দ্রুত হইয়া উঠিল।—তাড়াতাড়ি দিয়াশলাইটি হাতে করিয়া কাঠি বাহির করিতে তাহার বহু বিলম্ব হইয়া গেল—হাত এমনি কাঁপিতেছিল!………

বাতি জ্বালিয়া সান্ত্বনার দিকে চাহিয়াই সীমাহীন দুরন্ত আতঙ্কে নীহারের হৃদয় ও মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া চোখের দৃষ্টি কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতে পারিল না।………

সান্ত্বনা স্থির হইয়া শুইয়া আছে—

কিন্তু ঐ কোটর-ছাড়া পলকহীন ভয়ঙ্কর চক্ষুতারকা ত' সান্ত্বনার নয়………

আর তার কণ্ঠের উপর দশটি অঙ্গুলির নিষ্পীড়নের ঐ চিহ্ন!………

নীহারেরও চক্ষু আরও বিস্তৃত ও পলকহীন হইয়া সেই রক্তবর্ণ দশটি চিহ্নের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। দেহের শক্তি কণ্ঠের শব্দ নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া সে যেন একটা স্পন্দহীন মূর্তির মত কেবলি শূন্যে দোল খাইতে লাগিল!………

স্নায়ুর ও মনের এই নিরালম্ব দৌর্ব্বল্য তাহাকে বেশীক্ষণ সহ্য করিতে হইল না—

জ্ঞান হারাইয়া সে মৃতদেহের পাশেই লুটাইয়া পড়িল।...

যখন ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইতে লাগিল তখন মানসিক যন্ত্রণা লঘু হইয়া গেছে।—

মনে হইল—পুনর্ব্বার সে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে।.........

এমন অবিশ্বাস্য স্বপ্নাতীত ঘটনা ঘটিতেই পারে না।.........

অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া সে নূতন করিয়া চমকিয়া উঠিল—

বাতির আলো সান্ত্বনার নিস্পন্দ দেহের উপর নাচিতেছে—

শুভ্র গৌর কণ্ঠের উপর রক্তবর্ণ চিহ্নগুলি মিথ্যা হইয়া যায় নাই.........

সেইদিকেই চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নীহার সহসা মৃতদেহ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল—

অতি সাবধানে সান্ত্বনার বাঁ হাতখানা মুষ্টির মধ্যে তুলিয়া লইল.........কান পাতিয়া রহিল, যেন নাড়ী চলার শব্দ হইবে.........শব্দ নাই, কিন্তু নাড়ী বুঝি চলিতেছে—

হঠাৎ সান্ত্বনার বুকের উপর কান দিয়া কাত্ হইয়া পড়িল.........

বুক বুঝি ধুক্ ধুক্ করিতেছে ....

না, না,—

রক্তের গতি একেবারে থামিয়া গেছে—

জীবনের ক্ষীণতম কম্পনও কোথাও অবশিষ্ট নাই। দশটি আঙুলের চাপ দিয়া প্রাণের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত সে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।.........

সহসা একটা নিঃশব্দ বীভৎস হাস্যভঙ্গীতে নীহারের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।...

একি অভিনয়.........একি তামাসা!

যে ভোজন-ব্যাপারের এই পরিণতি সে ত তখনকার কথা; রায়ের পাশবিক আচরণ, সান্ত্বনার সঙ্গে কলহ—

সান্ত্বনার সঙ্গে কলহ!.........

নীহার সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সান্ত্বনার সঙ্গে কলহের মত হাসির কথা আর কিছু নাই............ পাগলের হাসির মত অর্থহীন এই হাসি যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেম্নি অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল।.........

নীহার শয্যা হইতে নামিল—

টলিতে টলিতে যাইয়া দরজা জানালা সবগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিল ——

শয্যার পার্শ্বে আসিয়া হেঁট হইয়া সান্ত্বনার চোখের পাতাদুটি পরস্পর মিলাইয়া দিল।.........

বাতি জ্বলিতেই লাগিল ——

নীহার শয্যায় উঠিয়া সান্ত্বনার দেহের পার্শ্বে শয়ন করিল ——

দেহটি দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখখানা বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল.........

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভুলিয়া শুষ্কচক্ষে শুধু সে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল......... *

---

* ইংরাজী হইতে

প্রার্থনা

হাফেজ

চাঁদের মত সুন্দর তোমার মুখ—দুনিয়ার যত কিছু সৌন্দর্য্য তোমারই দেহে! তোমাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণ যে যায়! প্রাণ কি সত্যই যাবে না আবার ফিরে আসবে?—তোমার কি আদেশ?

ভাগ্য আমার ঘুমিয়েছিল,—কিন্তু তোমার জ্যোতির্ম্ময় মুখের ছটায় চোখে আমার জল এসেছে-এবার বুঝিবা সে জাগে!

চিত্ত আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে বন্ধু! আমার মাথার দিব্যি,—চিত্তহারীকে সংবাদ দাও!

বসন্তের হাওয়া যখন বইবে বন্ধু, তোমার উদ্যান থেকে ফুলের দুটো ছেঁড়া পাপ্‌ড়িও অন্তত পাঠিও। আর কিছু না পাই তোমার উদ্যান-ধূলির সৌরভ ত' পাব।

সাবধান বন্ধু, অনেক জীবনের উৎসর্গ হয়ে গেছে এই পথের ওপর—তোমারই উদ্দেশে! আমার কাছে যখন আসবে, আঁচল সাম্‌লে এসো—নইলে বলির রক্তে বস্ত্রাঞ্চল তোমার রাঙা হয়ে উঠবে।

ভগবানের দোহাই, হে রাজাধিরাজ! আমায় একটুখানি উচ্চ অভিলাষ দাও! তোমার গগনস্পর্শী বিরাট প্রাসাদের পদপ্রান্ত চুম্বন করে' আসি।

হাফেজ প্রার্থনা করছে, শোনো শোনো, স্বস্তিবচন বল! তোমার মুখনিসৃত অমৃতধারায় আমার জীবনের একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাক্!

মাটির ঢেলা

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ্ দিলে কে তোর গায়ে ?
গড়্‌লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে ?
ভুখ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে ?
কোন্ খেয়ালির খেলেনা তুই হায়রে !
কোলের পরে দুলিস্ কভু
মাটির পরে যাস্ পড়ে—
মলিন ধূলা লাগে সকল গায় রে !

আঘাত খেলে বুক ফাটে তোর
চোখের জলে যায় গলে,
চোট্ খেয়ে তুই লুটিয়ে পড়িস্ ভুঁয়ে।
কান্না হাসির দোলা লাগে,
রঙ যা কিছু যায় চটে,
বর্ষাধারায় যায় রে সে যায় ধুয়ে।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ডাক্‌ছে তোরে তোর মাটি,
টান্‌ছে আপন স্নেহ-শীতল কোলে।
ঢেউএর পরে জীবন-ভেলা
এমন সেথা দুল্‌বে না,
ভিড়্‌বে নাক ভীড়ের হট্টগোলে।

ব্যাঘাত নাহি আঘাত নাহি,
খাম্‌খেয়ালির নেই খেলা,
নেইক মরণ-ভয়ের ভীষণ ভুর্‌কুটি।
বৃষ্টি-পরশ সরস-দেহে
জাগ্‌বে তৃণ হয়ত রে,
একটি ছোট উঠ্‌বে কুসুম ফুটি।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুল্‌লে তোর চল্‌বেনা,
তুই যে মাটি চিরকালের মাটি।
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদিবা রঙ যায় লেগে,
মাটি রে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

বিচিত্রা

এবার আইরিশ সাহিত্যিক জর্জ বার্ণার্ড শ সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। বিগত ৪৫ বৎসরের মধ্যে তিনি নাটক, উপন্যাস, সমালোচনা ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ রচনা দ্বারা বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডবলিন নগরে তাঁহার জন্ম। ১৫ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িয়া জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আয়ার্লণ্ডে ৫ বৎসর চাকরী করিয়া ১৮৭৬ সালে তিনি সপরিবারে লণ্ডনে আসিয়া টেলিফোন কোম্পানীর আফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন।

তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুইখানি শ্রীমতী আনিবেসান্ত সম্পাদিত "Our Corner" পত্রিকায় এবং তৃতীয়খানি "To-day" নামক সোশিয়ালিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি ফেবিয়ান সোসাইটি নামক বিখ্যাত সোশিয়ালিষ্ট দলের সভ্য হন এবং উদ্যমের সহিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দ্বারা সোশিয়ালিষ্ট মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি কেরাণীগিরি ছাড়িয়া সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগেন। যথাক্রমে পেলমেল গেজেট, ষ্টার, ওয়ার্ল্ড এবং স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং নাট্যাদির সমালোচনা লিখিতেন।

১৮৯১ সালে "ইবসেনিয়ানার সারতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে নরওয়ের জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার ইবসেনের নাটকগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া তিনি ইংরেজ পাঠকের চিন্তাস্রোত এক নূতন দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নাটকের পর নাটক রচনা করিয়া সাহিত্য ও চিন্তাজগতে আলোড়ন উপস্থিত করিলেন।

মধ্য ভিক্টোরিয় যুগে ব্রিটিশ সমাজ বাণিজ্য-সম্পদ্ ও সাম্রাজ্য গৌরবের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহা অটুট থাকিল না। কলকারখানার ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সামাজিক সমস্যা ও সংঘর্ষের উদ্ভব হইতে লাগিল। মহাজন ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্রের সংঘর্ষ হইতেই সোশিয়ালিষ্ট মতের উদ্ভব।

ইংরেজী সাহিত্যে যে সমস্ত প্রতিভাবান্ লেখক এই নবীন চিন্তাপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন তন্মধ্যে বার্ণার্ড শ-এর রচনা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক। তাঁহার বিদ্রুপাত্মক নাটকগুলির জন্য অনেকে তাঁহাকে ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েরের সহিত তুলনা করেন। তাঁহার বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাণে সমাজের মধ্যে যত কিছু ভণ্ডামি, কপটতা, মিথ্যা জাঁক ও ফাঁকা আওয়াজ ধর্ম্ম, নীতি ও ভদ্রতার নাম লইয়া জাঁকিয়া বসিয়া আছে, সমস্তই ছিন্ন ফানুসের মত ফাঁসিয়া যায়।

তিনি একদিকে যেমন নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক, অন্যদিকে নাট্যশিল্পের রচনাপদ্ধতিতেও পথ প্রদর্শক। যে সমস্ত নাট্যকারের চেষ্টায় ইংলণ্ডের নাট্যশিল্প আধুনিক যুগে বাস্তবতা ও নবজীবন লাভ করিয়াছে বার্ণার্ড-শ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার প্রধান কয়টি নাটকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Mrs. Warren's Profession; Arms and the Man; Candida; Captain Brassbounds' Conversion; The Doctor's Dilemma; John Bull's Other Island; Man and the Superman; The Philanderer.

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

দিকে দিকে আবার সেই স্বরাজ্য দলেরই জয়?

দেশের ও দশের যে ইহাতে কত বড় ক্ষতি, তাহা আজও লোকে ভাল করিয়া বুঝিল না?

অথচ বুঝাইবার কত চেষ্টাই না হইল! কত যুক্তি, কত অর্থ, কত ফন্দী, কত ফিকির, কত কুৎসা, কত কালি, —কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না?

মেকীর দলই জিতিয়া গেল? বীর-রসের অভিনয়ই বাহবা পাইল?

রেস্‌পন্‌সিভিষ্ট্ দলের অক্ষয় কবচ-পরা বীরবৃন্দের মনে মনে লড়াইয়ের কত সূক্ষ্ম কৌশল ও বিচিত্র কসরৎ সঞ্চিত ছিল, কত হিসাব করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া সেগুলি প্রয়োগ করা হইত, তাহা অর্ব্বাচীন নির্ব্বাচক-মণ্ডলী একবার ভাবিয়াও দেখিল না?

* * *

কিন্তু অনর্থ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে—

এখন উপায় কি?

দেশের লোকে একথা না ভাবুক, ভাবিবার দায় যাঁহাদের, তাঁহারা ভাবিবেনই—এবং ভাবিতেছেনও।

... ...

স্বরাজীরা ত ডায়ার্কি ভাঙ্গিতে পারিল না! এবারেও পারিবে না—

কাউন্সিলে এবারে উহারা আরও পঙ্গু হইয়া রহিবে—

বোকার দল যদি মন্ত্রীত্ব লইত! বা অপর কাহাকেও লইবার সহায়তা করিত!

সে সু-বুদ্ধি যখন উহাদের হইবেই না, তখন কাউন্সিল যাহাতে চলে, মন্ত্রী-পরিষৎ যাহাতে গড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

আর যদি একান্তই সে-সুবিধা না হয়, তখন অগত্যা ঐ গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই কখনও এদিক কখনও ওদিক করিব।

এ ছাড়া আর কি করিতে পারি?

* * *

বাস্তবিক, এ-ছাড়া আর কিছুই করিবার সামর্থ্যও তাঁহাদের নাই।

ঐ গণ্ডীর বাহিরে তাঁহাদের দৃষ্টি ত আর এতটুকুও চলে না!

দেশের গণ-শক্তির উপর তাঁহাদের এতটুকু আস্থা ত নাই!

শ্রদ্ধাই নাই ত আস্থা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই বার বার হিসাব কষিতে গিয়া মাথা গুলাইয়া যায়—

ঐ অতগুলি সরকারি সভ্য......ঐ অতগুলি মনোনীত সভ্য......ঐ অতগুলি মুসলমান সদস্য.....ঐ উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে নানান্ দিক্ দিয়া নানান্ আইন-সম্মত বাধা......

দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

* * *

কিন্তু ঐ দৃষ্টি যদি অন্যদিকে প্রসারিত হইত!

...তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে এই সুবিপুল বাধাকে ভাঙিবার, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া নূতন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা দিবার শক্তি একমাত্র গণ-শক্তিরই আছে।

* *
*

কিন্তু গণ-শক্তির উদ্বোধন কি এমন ভাবে হয়?

এম্নি দায়িত্বশূন্য অক্ষম মন্ত্রীত্বের ঝক্‌ঝকে তক্‌মাটি বুকের কাছে আঁড়াইয়া ধরিয়া?

কেবলই কাউন্সিলের মধ্যে নিজেদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিঃশেষে ব্যয় করিয়া?

মুরলীধর বসু

* *
*

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই কর্পোরেশনকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন কিন্তু তাহা দেন নাই। এইজন্য কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট মুখে ও কাগজে-কলমে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু মুখের কথা আর লিখিত রেজলিউশন কার্য্যে পরিণত হয় খুব কমই। দেখা যাউক, বোম্বাইর এই মোকদ্দমার ফল কি দাঁড়ায়।

*
* *

বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট একটা নূতন ট্যাক্স বসাইতে সংকল্প করিয়াছেন। দেশের লোককে কত রকমেই ট্যাক্স দিতে হইতেছে তার ইয়ত্তা নাই। তার উপর আবার এই শিক্ষা-কর। গরীব প্রজার ভাত চলে না। কিন্তু ট্যাক্স দিতেই হইবে। উপায় কি? রাজনীতির কথা উঠিলে শুনিতে পাই আমাদের উপকারের জন্যই ব্রিটীশ জাতি এদেশের শাসনভার নিয়াছেন। আমরা নিজেদের হিতাহিত এখনও ভাল বুঝিতে পারি না। জাতির হিসাবে আমরা এখনও শিশু; তাই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের ভাল হয় তারই ব্যবস্থা করেন। উত্তম। কিন্তু শিক্ষার কথা উঠিলেই দেখিতে পাই গবর্ণমেণ্ট খরচের হাত গুটাইয়া বসেন। তখন আত্ম-নির্ভরতার উপদেশ পাইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এইজন্যই বোধ হয় নূতন ট্যাক্সের ব্যবস্থা।

*
* *

তবু মন্দের ভাল। সরকারবাহাদুর টাকা ত দিবেন না। কাজেই, দেশের লোক অনশনে থাকিয়াও যদি একটু লেখাপড়া শেখে, তাহা হইলেও মঙ্গল। তবে এই নূতন শিক্ষা-কর হিসাবে যে টাকাটা আদায় হইবে, তার সবটাই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ হইবে ত?

*
* *

টাকা দিতে হইবে আমাদের, কিন্তু আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। একটা নূতন শিক্ষা-সমিতি হইবে, তার প্রেসিডেণ্ট হইবেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। আর সদস্য হইবেন সরকারী কর্ম্মচারী অথবা সরকারের মনোনীত বে-সরকারী ব্যক্তি। আমরা ত এখনও ক্ষমতা পরিচালনের যোগ্য হই নাই!

*
* *

উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও সরকারের ঔদাসীন্য কয়েক বৎসর যাবৎই চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আচরণের কথা সকলেই জানেন। উহার পুনরালোচন নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের কতটা টান তাহা প্রকাশ পায়। যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন রাজধানী ছিল কলিকাতায়, স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর হইলেন চ্যান্সেলার এবং সেই অবধি সংস্কার প্রণালীর প্রবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন।

পুরাতন সিনেট হাউস নির্ম্মিত হইয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্ক নাই, বোধ হয় সেই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি নোটিশ জারি হইয়াছে যে, হয় সিনেট হাউস কিনিয়া লও আর না হয় ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা বিক্রির বন্দোবস্ত করিবেন।

*

* *

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের আইনের ভিত্তিতে; উহার যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাও ভারত গবর্ণমেণ্টের আইনের বলে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাদেশিক হইয়াছে বলিয়াই কি ভারত গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব-সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল? আর তখনকার ব্যবস্থা সবই উল্টিয়া যাইবে? কলিকাতার লাট ভবন ত আগে বড় লাটেরই বাড়ী ছিল। ওটা কি গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া নিয়াছেন? কলিকাতার ভারত গবর্ণমেণ্টের আর যে সকল এমারত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে সেগুলি কি কেনা হইয়াছে? আলিপুরের বেল-ভেডিয়ারে যে এখন বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় অবস্থান কালে বাস করেন তার জন্য কি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভাড়া পাইয়া থাকেন? ও গুলিও যেমন সরকারী বাড়ী, সিনেট হাউসও তাই। তবে সিনেট হাউসের সম্বন্ধে এরূপ প্রস্তাব কেন হইল?

*

* *

আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ত মনে হয় ভারত গবর্ণমেণ্টের এরূপ দাবী আইন সঙ্গত নয়। জেদ ধরিলে ইহার মীমাংসা আদালতে হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ভাইস্-চ্যান্সেলরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি দেশের ডাক মনে করিয়া এ পদ স্বীকার করিয়াছেন। বড় আশ্বাসের কথা। আমরা আশা করি সিনেট হাউসের ব্যাপারে তিনি দেশের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিতে নির্ভীকভাবে প্রয়াসী হইবেন।

স

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্তৃক, ১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, এলবার্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

প্রতীক্ষায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

কালি-কলম

১ম বর্ষ]　　কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সাল　　[৭ম সংখ্যা

ঋতু মঙ্গল

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঋতুগণ—তাঁরা মঙ্গলের জন্যই। আসা যাওয়া তাঁদের ঋতের নিমিত্তে! ঋতপরায়ণ ঋতুদেবতা-গণ রীত পালন করেন, ধৃতব্রত সকলে মঙ্গল বহন করেন, কৃতকর্ম্মা সকলে নিয়ত বিচরণ করেন মঙ্গলের পথে।

বৈশাখের রুদ্র দেবতা, অগ্নিময় রূপ তাঁর! তাঁর সামনে দাঁড়ায় ধরিত্রী আকাশ একেবারে রিক্ত অঞ্জলি পেতে, পিপাসা জানায় তৃষাতুর কাতর প্রাণ! দিক্-বধূ সকলে—রুদ্র দেবতার উপাসিকা তাঁরা—তপস্যা করেন বর্ষণমঙ্গল কামনা করে'। রুদ্রের বর আসে রৌদ্র-দীপ্ত আকাশ ছেয়ে ঝড় দিয়ে।

প্লাবন আসে বর্ষণের দেবতার,—নব নীরদ শ্যাম শোভার প্লাবন, ভাঙ্গে বানে, ভাসায় বন্যায়, বিদ্যুৎ হানে, বজ্র হানে, সকল অপূর্ণতার উপরে নামে বর পরিপূর্ণ ধারায়,—জেগে ওঠে দিকে দিকে প্রাণ সবুজ উচ্ছ্বাসে।

ভদ্রা যিনি—ভরা নদী বেয়ে আসেন তিনি। দুই কূলে উপছে পড়ে তাঁর আশীর্ব্বাদি মালা—তরঙ্গ রেখার ছলে গাঁথা ফুটন্ত আশীর্ব্বাদ!

শরৎলক্ষ্মী আলোর আশীর্ব্বাদ ভরে আনেন নীল আঁচলে—অন্নপূর্ণা তিনি! সোনার ধানে ভরা

সোনার তরী চলে দিকে দিকে তাঁর আশীর্ব্বাদের ভার বয়ে মন্থরগতি—যেন তারা নীল আকাশের বলাকা!

পরিপূর্ণতার ভারে কাঁপে হেমন্তের করপুট, শীতল তাঁর চাহনী! তিনি বলেন, নিয়ে যাও আশীর্ব্বাদ—শিশিরে ধোয়া নির্ম্মাল্য।

শীত দেবতার শুভ্র শান্ত রূপ! ক্লান্তিহর তিনি—স্বরা ঝরে যায় তাঁর স্পর্শে! অমৃত শীতল নির্ম্মল আশীর্ব্বাদ তাঁর শিউলি ফুলের মতো ঝরে হিমের রাতে চুপে চুপে!

অনন্ত আনন্দ অনন্ত শোভা অনন্ত ঐশ্বর্য্য—বসন্ত দেবতার!

যৌবন-শ্রী তাঁকে বরণ করে ঋতু-মালা-হাতে—বিশ্বের যৌবন-শ্রী—পিক-কণ্ঠী বীণাবাদিনী বিচিত্র-রূপা বসন্ত-শ্রী তাঁর আশীর্ব্বাদ—সকল বরের শেষ সকল সুরের শেষ সকল পরিপূর্ণতার শেষ এক ফোঁটা মধু।

নর-নারী

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

পাতায় পাতায় শ্যামলতার রসময় হিল্লোল—প্রকৃতির সবুজ সৌন্দর্য্যের মহিমা দেখিয়া বিভোর হইয়া যাই আনন্দে বিস্ময়ে। প্রকৃতির স্তব রচনা করি, কখনো প্রিয়া বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করি, কখনো মাতা বলিয়া ডাকি, ডাকিয়া ডাকিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই, অপার অতল রস-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া পরম বিরাম লাভ করি। গাছে গাছে কেবলি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য দেখি, কিন্তু দেখি না তাহাকে যে ধরণীর এই অনন্ত রসকে স্ফূর্ত্তি দিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ধরণী সুপ্রকাশ হইয়াছে।......

বীজের ওই তো প্রকাশ বনে বনে, পথে প্রান্তরে, রূপে রূপে; তাই তো জগৎ হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। বীজের মধ্যে একটি অপ্রকট রূপ রসের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে জন্মকাল হইতে। ধরণীর রস-ধারাকে আকর্ষণ না করিয়া তাহার মুক্তি নাই, অপ্রকাশের কারাগারে তাহার অন্তর কেবলি কাঁদে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে অতি কাতর ভাবে সে ধরণীর সঙ্গ কামনা করে। রসের স্পর্শ না পাইলে রূপ প্রকট হইতে পারে না যে!

ধরণী যে পায়ের নীচে মৌন স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারো তেম্‌নি একটি একান্ত প্রয়োজন নির্ব্বাক্ বেদনা লইয়া আত্মপ্রকাশের পথ চাহিয়া আছে। তাহার অন্তরের গুপ্ত রসসম্ভার যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে যদি সে যাহার পথ চাহিয়া আছে তাহার দেখা না পায়, তাহার সঙ্গ না পায়! বীজ যেমন আপনার পরিচয়ের পথ খোঁজে তেম্‌নি ধরণীও যে আপনাকে জানিতে চায়! যতদিন সে আপনাকে জানে না ততদিন সে নীরসা বন্ধ্যা হইয়া পড়িয়া থাকে। বীজ আপনার রূপের পরিচয় চায়, রসের বিলাসে ও বিকাশে সে আপনাকে দেখিতে পাইয়া সার্থক হয়।

২

একজন দান করে, এবং সেই দানের দ্বারা আপনার সার্থকতা লাভ করে। ধরণীর বুকে এই যে অপর্য্যাপ্ত রস নিহিত হইয়া আছে তাহার প্রকাশ কোথায়? ওই তো পাতার চিকণ সবুজে, ফুলের বর্ণে-গন্ধে রসের আভা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তাই ধরণীর এই দানের মধ্যে একটি বিপুল স্বার্থ এবং স্বার্থকতা রহিয়াছে। এই দানের মধ্যে সীমাহীন সুনিবিড়তা রহিয়াছে। বীজের সর্ব্বদেহ ও সর্ব্ব চেতনার কণায় কণায় ধরণী আপনার রসকে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহা না করিতে পারিলে দান তাহার যত বৃহৎই হোক না, নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া যায় সেই দান; তাহাতে দান এবং গ্রহণ দুইই নিরর্থক হইয়া যায়। এই জন্য ধরণীর আত্মদানটি যেমন পরিপূর্ণ হওয়া চাই তেমনি তাহার রসকে আকুল আগ্রহে পান করিবার পিয়াসী চাই।

তাই বলিতে হয় যে, পিয়াসী আপনার অন্তরের আকুল পিপাসার দ্বারাই ধরণীকে তাহার আহ্বান জানায়। ধরণী যে রূপের সন্ধানী হইয়া চুপ করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, সেই রূপরাজের বংশী বাজে ওই পিপাসার লহরে লহরে।

একটি পরম পিপাসার টানে ধরণীর সঙ্গে বীজের মিলন। এই পিপাসা নিবৃত্তির মধ্য দিয়াই উভয়ের স্বরূপ সিদ্ধির পথ—একজন তাহাতে আপনার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর একজন আপনার রসময় শ্রী প্রত্যক্ষ করিয়া সার্থক হয়।

৩

শুনিতে পাই যে নিজে অভাবগ্রস্ত সে অপরের অভাব দূর করিতে পারেই না। অথচ এই তো দেখিতেছি প্রতিনিয়ত ওই দুই অভাবদিগ্ধ একে অন্যকে পাইয়া শান্ত স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতার আস্বাদন করিতেছে। তাহার কারণ ইহাদের অভাব পরস্পরের মুখাপেক্ষী। ধরণী আপনারই পরিচয় লাভের তৃষ্ণায় ব্যথিতা, বীজ আপনারই শ্যামল প্রকাশের ব্যগ্রতায় ব্যথিত, সত্য; আত্ম-পরিচয়, স্বরূপসিদ্ধি উভয়েরই একমাত্র প্রার্থনা। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ লাভ অপরের মধ্য দিয়া; ইহাদের সার্থকতা একে অন্যের অপেক্ষা রাখে। রস না পাইলে কাহার শক্তিতে রূপ প্রাণময় প্রকাশ লাভ করিবে? রূপকে না পাইলে রস কাহাকে শ্রীময় করিয়া সার্থক হইবে?

এই তো গেল পরিচয়ের কথা। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধরণীর এবং অঙ্কুরের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় না। এতদিন ছিল পরিচয়ের অন্ধ তৃষ্ণা, অভাবের জ্বালা। আজ আপনাকে আপনি জানিয়া অন্ধকারের নিপীড়ন ঘুচিল, কিন্তু কর্ম্মের অবসান তো হইল না। আপনাকে জানিয়া পিপাসার নিঠুর দায় ঘুচিয়াছে, মৃত্যুর রাজ্য হইতে প্রাণের রাজ্যে প্রবেশ লাভ হইয়াছে।

৪

ধরণী আপনার নিবিড় আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া আপনার অনন্ত রস-মাধুরীকে উপলব্ধি করিল। এই যে জাগ্রত অঙ্কুরান রস-নির্ঝরিণী—সে আপনাকে ঢালিয়া না দিয়া থাকিতে পারে না যে! যে নারী ছিল প্রেয়সী, তাহার বুকে আজ অমৃতের পূর্ণতা জাগিয়া উঠিয়া, তাহার সমগ্র অন্তরকে যে মাতৃত্বের বেদনায় মহীয়সী করিয়া তুলিল!

আজও সে পিয়াসীর প্রতীক্ষা করে কিন্তু সে দিনে আর এদিনে কতখানি আকাশ-পাতাল ভেদ! নারী যেদিন ছিল প্রেয়সী, যেদিন সে প্রিয়স্পর্শের কামনায় আতুর হইয়া ছিল সেদিন সে নিজে ছিল কাঙাল, রূপের কাঙাল। সেদিন তো পিয়াসী বন্ধুকে পিয়াসী বলিয়া সে গ্রহণ করে নাই। সেদিন সে আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহার কাছে, তাহার রূপের মধ্যে আপনার রসের চরিতার্থতা বাচ্ঞা করিয়াছিল; সেদিনকার পিয়াসী তাহার নিকট আসিয়াছিল বঁধুর বেশে, স্বামীর বেশে, জীবন মরণের চরম সহায়ের বেশে।

আজ কিন্তু সহায়ের প্রতীক্ষা নাই, আজিকার প্রতীক্ষা অসহায়ের। আজ সে আশ্রয়ের কাঙাল নয়, আজ তাহার পরাণ কাঙাল হইয়া উঠে আশ্রিতের জন্ত। সেদিনের প্রেয়সী আজ মাতৃত্বের পথে যাত্রা করিয়াছে। প্রেয়সীর বুকে ছিল রূপের মধ্যে আপনারই রসকে উপলব্ধি করিবার কামনা; মায়ের বুকে আসিয়াছে যত জীর্ণতা, যত শীর্ণতা, যত শুষ্কতা সব রসের বন্তায় ভাসাইয়া দিয়া রূপকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলার বেদনা ও করুণা।

৫

প্রেয়সীর জগতে পিয়াসীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম সে রূপ শক্তি-সন্ধানীর রূপ। সেদিন সে প্রেয়সীর একান্ত কামনা ও আত্মনিবেদনের মধ্যে তাহার আশ্রয়-দাত্রীর রূপকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসরই পায় নাই; সেদিন সে আপনার মূল্য ও মর্য্যাদার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। সেদিনকার পিপাসা প্রত্যক্ষভাবে রসপিপাসা নহে, সে পিপাসা ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার পিপাসা। তাহাকে দিয়া জগতে কাহারও প্রয়োজন আছে, এই অনন্ত বিশ্বের নগণ্যতার মধ্যে সে অকিঞ্চিৎকর নহে ইহাই সেদিন সে আপনার জ্ঞানে এবং অভিমানে জাগ্রত করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল। সেদিনও প্রেয়সীর সত্যকার প্রেমটি, তাহার দানের মহিমাটি প্রত্যক্ষ হইতে পারে নাই। চায় সে রসের অভিসিঞ্চনে অন্তরের রূপ-বিকাশ; কিন্তু এই রূপ-বিকাশের কথাটি চাপা পড়িয়া যায় তাহার অহমিকার আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে। জানিতে চায় সে আপনার স্বরূপকে, কিন্তু অহঙ্কার তাহাকে লইয়া যায় আর এক দিকে, সেটি হইতেছে তাহার অহমিকাটিকে সর্ব্বোচ্চে তুলিয়া ধরিবার উগ্র বাসনা। প্রেমের সাধনার পথে কাম আসিয়া অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া বসে।......

কিন্তু রসের মহিমা যে অপরূপ! সত্যকার রস-সিঞ্চনে পিয়াসীর অন্তরের স্বরূপ না ফুটিয়াই পারে না। তাই যেদিন অন্তরে আপনার রূপটিকে সে উপলব্ধি করে সেদিন রসময়ী ধরণীকে সে আপনার অন্তর-স্বরূপের চিররসাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সেদিনই রসময়ী ধরণীকে তাহার সত্য স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পিয়াসী সেদিন রসমাতৃকার চির অসহায়, চির আশ্রিত শিশু। তখন চাহিয়া দেখি ওই বনের কচি শ্যাম পাতাগুলি মায়ের বুকে শিশুর মত রসপানে বিভোর, আনন্দের চঞ্চল নৃত্যে আকাশকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

নারীর রস-সাধনার সূত্রপাত প্রেয়সীর বেশে, কিন্তু তাহার পর্য্যবসান মহিমাময় মাতৃত্বের পরম করুণায় ও স্নেহে। নরের স্বরূপ সিদ্ধির সূত্রপাত পুরুষের বেশে, পীরিতি-পীয়াসীর বেশে, তাহার পরিসমাপ্তি শাশ্বত-শিশুত্বের নিরহঙ্কার অসহায়তায় ও ভালবাসায়।

কালি-কলম

১ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৩ [৯ম সংখ্যা

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

একটা নেশন আজ ভারতবর্ষে চোখের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিতেছে—এত দ্রুত এত স্পষ্ট তাহার কাজ চলিয়াছে যে কাজের বাহিরের ধারাটি যে কেহ ইচ্ছা করিলেই অনুসরণ করিতে পারিবেন; তবে যাঁহার দরদ আছে, দৃষ্টি আছে তিনিই আবিষ্কার করিতে পারিবেন কাজের পিছনে আছে কোন্ কোন্ শক্তি, কি কি উপকরণই বা সেখানে ব্যবহার করা হইতেছে, কোন্ রেখাবলী ধরিয়া তাহার ভবিষ্যতের দিব্য রূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। এই নেশন কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মশালা হইতে আন্‌কোরা তৈয়ার হইয়া আসিতেছে না, আধুনিক অবস্থাচক্রের দৌলতে সৃষ্ট তাহা নূতন একটা জাতিও নয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম একটা জাতি, শিক্ষা দীক্ষায় গরিষ্ঠ একটা সমাজ—অজেয় যাহার প্রাণশক্তি, অপ্রমেয় যাহার বিপুল সৃষ্টি, সুগভীর যাহার জীবনধারা, অপরিসীম যাহার সামর্থ্য—সে ভিন্ন গোষ্ঠী হইতে, বিদেশের বিবিধ ভাণ্ডার হইতে বহুতর শক্তির বীজ নিজের মধ্যে এতদিন সঞ্চয় করিয়া আসিয়া আজ চাহিতেছে সংহত সজীব রাষ্ট্রীয় ঐক্যে শরীরী হইতে, পূর্ণ বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া চিরকালের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে। এই জাতি এযাবৎ অবশ্য ছিল সমানধর্ম্মা বহুতর নেশনের একটা সমষ্টি মাত্র—এক জীবনধারা, একই শিক্ষাদীক্ষা সেখানে ছিল; আর এই মূল একত্বের জোরে চিরকাল ঐক্যের দিকে সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার মধ্যে এত সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ছিল যে নিত্য নূতন বৈচিত্র্যকে জন্ম দিতে দিতে একদিকে সে যেন আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে,

অন্য দিকে তেমনি শুধু একটা দেশ নয় কিন্তু মহাদেশকেই সুশৃঙ্খলিত করিয়া তুলিবার পক্ষে যত অলঙ্ঘ্য বাধা তাহা সে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। আজ সময় হইয়াছে, সেই সকল বাধা এখন দূর করা সম্ভবের মধ্যে আসিয়াছে। অতীতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমাদের জাতিটি যে প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই একই প্রয়াস সে করিতে চলিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন রকমের অবস্থার মধ্যে। একটু গভীর ভাবে ঘটনা চক্রের দিকে নজর দিলেই বুঝা যাইবে এবারকার সাফল্যে আর সন্দেহ নাই। কারণ, আমরা দেখিতেছি প্রধান প্রধান বাধাগুলিই দূর হইয়া গিয়াছে কিম্বা প্রায় দূর হইবার পথে চলিয়াছে। তবে আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মাত্রা কিন্তু আরও বেশি ; আমরা বলিতে চাই, সফলতা আজ অবশ্যম্ভাবী—কারণ ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ঐক্য, মহত্ত্ব ও পূর্ণ সিদ্ধি জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

দেশ-সেবক কর্ম্মযোগী যিনি তিনি এই শ্রদ্ধা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এই শ্রদ্ধাতেই নিরন্তর চলিবেন—বাধা বিপত্তি যতই বিপুল, আপাতদৃষ্টিতে যতই দুর্লঙ্ঘ্য মনে হউক না কেন, কখনও তাহাতে বিচলিত হইবেন না। আমাদের বিশ্বাস, ভগবান আমাদের সাথে—এই বিশ্বাসের জোরেই আমরা জয়ী হইব। আমাদের বিশ্বাস, মানবজাতি আমাদিগকে চাহিতেছে—মানুষের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য আমাদের অনুরাগ ও সেবা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবে, আমাদের কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করিয়া ধরিবে।

আমরা যে কাজের ভার লইব তাহা একান্ত বাহিরের নয়, তাহা অন্তরের, তাহা আধ্যাত্মিক। আমাদের লক্ষ্য শাসনযন্ত্রের কেবল রূপ পরিবর্ত্তন করা নয়, কিন্তু একটা নেশনকে গড়িয়া তোলা। এই কাজের একটা অঙ্গ রাজনীতি, সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা অঙ্গ মাত্র। আমরা শুধু রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিব না, কিম্বা সমাজ-সমস্যা, সাধন-শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কোনটিকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া লইয়া চলিব না। কিন্তু এই সবগুলি ধারাকে একটি বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিব—তাহার নাম "ধর্ম্ম", আমাদের দেশের ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম হইতেছে বিশ্বের ধর্ম্ম। জীবন-গতির আছে যে একটা মহান ধারা, মানবজাতির ক্রমোন্নতির আছে যে একটা গভীর তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ও উপলব্ধির আছে যে বিচিত্র রহস্য—ভারতবর্ষ তাহার রক্ষক, তাহার বিগ্রহ, তাহার প্রচারক। এই জিনিষটিকেই বলা হইয়াছে "সনাতন ধর্ম্ম"। বিদেশের পরধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ভারতবর্ষ তাহার সনাতন ধর্ম্মের জাগ্রত প্রাণটি হারাইয়া প্রায় শুধু কাঠামটি লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ভারতের এই ধর্ম্মকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া যদি না চলা যায়, তাহার তবে কোনই অর্থ থাকে না। শুধু আবার জীবনে নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সাহিত্য, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও প্রেরণা সকলের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রতিভা প্রবেশ করিয়া সকলকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম বুদ্ধি দিয়া অনুধাবন করা, সত্য বলিয়া উপলব্ধি

করা, হৃদয়কে তাহার সমুচ্চ প্রেরণার ছন্দে তুলিয়া ধরা, জীবনে তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া ধরা—ইহারই নাম আমরা দিতে চাই কর্ম্মযোগ। ভারতবর্ষ এই যোগকে মানবজীবনের লক্ষ্য রূপে স্থাপিত করিবে, তাই আমরা মনে করি আজ সে জাগিয়া উঠিতেছে। এই যোগের দ্বারাই ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা, ঐক্য, মহত্ত্ব অর্জ্জন করিবার, রক্ষা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য পাইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দেখিতেছে একটা আধ্যাত্মিক বিপ্লব, স্থূলের বিপ্লব শুধু তাহারই প্রতিক্রিয়া প্রতিচ্ছবি। ইউরোপ অবশ্য স্থূল যন্ত্রেরই উপর অনেকখানি ভরসা রাখে। সামাজিক ব্যবস্থা দিয়া, রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী গড়িয়া সে মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে চায়, তাহার বিশ্বাস পার্লামেন্টের একটি আইনের দ্বারা সে সত্যযুগ আনিয়া ফেলিবে। যন্ত্রপাতির খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু যদি সে জিনিষটি হয় অন্তরস্থ পুরুষের, পিছনকার শক্তির বাহন বা অবলম্বন। উনবিংশতি শতাব্দির ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মুক্তি, সামাজিক শুদ্ধি, আধ্যাত্মিক নবজন্মের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে সকল বিষয়ে নিরাশ হইতে হইয়াছে; কারণ, দেশের নিজস্ব যে অন্তর-পুরুষের প্রতিভা, যে কর্ম্মের ধারা, তাহা ভুলিয়া গিয়া সে পাশ্চাত্যের ভাব ও ভঙ্গী ধরিয়া চলিয়াছিল; সে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল যে ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি, ইউরোপীয় শৃঙ্খলা ও সাজসজ্জা তুলিয়া আনিতে পারিলেই ভারতে আমরা পাইব ইউরোপের সমৃদ্ধি, সামর্থ্য, ক্রমোন্নতি। আজ বিংশ শতাব্দিতে আমরা উনবিংশ শতাব্দির বিজাতীয় উদ্দেশ্য, আদর্শ, উপায় সব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, কেবল তাহাতে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে সেইটুকুই লাভ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু একমাত্র বর্ত্তমানকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া আমরা কখনই তুলিব না। আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখিব অগ্রে, দেখিব পশ্চাতে—পশ্চাতে অনুসরণ করিব আমাদের জাতির অতীতের সমস্ত ইতিহাস, সম্মুখে রাখিব যে মহোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নবীন ইতিহাস ভাগ্যবিধাতা তাহাকে রচিয়া তুলিতে উদ্‌যুক্ত করিতেছে।

"কাউন্সিল"-আদির ক্ষমতা বাড়াইয়া দাও, "ইলেক্‌শন" পদ্ধতি স্থাপন কর, "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" আমরা চাহি—ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির এই সব ধুয়া ধরিয়া চলিলে ভারতের যে রাষ্ট্রীয় মুক্তি হইবে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। অবশ্য রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে এই সকল জিনিষের কোন কোনটি হয়ত অস্ত্র হিসাবে আমাদের উপকারে আসিতে পারে—তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা অস্বীকার করি এই কথা যে অস্ত্র হিসাবে বা লক্ষ্য হিসাবে তাহারাই সব, তাহাদের ছাড়া আর কিছু নাই। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে ভবিষ্যৎ সিদ্ধির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাহার সহিত, এ সব জিনিষের নেহাৎ গৌণ ও যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ছাড়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আদৌ নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এক পাশে একটি প্রদেশ মাত্র হইয়া থাকা অথবা ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার একটা উপশাখা হওয়াই যদি ভারতের নিয়তি হইত তবে ঐ সকল জিনিষকে যথেষ্ট বিবেচনা করিলে দোষের হইত না। কিন্তু এই ধরণের ভবিষ্যতের জন্য কোন

প্রকার কষ্ট করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমাদের বিশ্বাস ভারত তাহার নিজের স্বাধীন জীবন, স্বতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষার পথে চলিয়া জগতের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে; আর ইউরোপ যে সকল রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে ভারত সে সকলের একটা সুষ্ঠু মীমাংসাই করিয়া দিবে—ইউরোপ সে চেষ্টায় নিত্য নূতন মত পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে, এক বিফলতা হইতে আর এক বিফলতায় আসিয়া পৌছিয়াছে, আর এই ব্যর্থ ব্যস্ত গতিকেই নাম দিয়াছে ক্রমোন্নতি বা "প্রগ্রেস্"। আমাদের লক্ষ্য যেমন মহান, আমাদের উপায়ও হইবে তেমনি মহান; সেই লক্ষ্যসিদ্ধির উপযোগী উপায় আবিষ্কার করিবার ও প্রয়োগ করিবার শক্তি খুঁজিয়া পাইতে হইবে আমাদের নিজেদেরই অন্তরে অনন্ত শক্তির উৎস যেখানে সেইখানে।

আমরা বিশ্বাস করি না বাহিরের যন্ত্রটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া, ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে সাজাইয়া দিলেই সামাজিক হিসাবে আমরা পাইব নবজন্ম। বিধবা-বিবাহ, বর্ণবিভাগের পরিবর্ত্তে শ্রেণীবিভাগ, পূর্ণ বয়সে বিবাহ, অন্তর্জাতিক বিবাহ, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে আহার—সমাজ-সংস্কারকের এই যে সব মুষ্টিযোগ, তাহাতে হয় যন্ত্রটার মধ্যে এদিক ওদিক একটু পরিবর্ত্তন। ইহাদের দোষ বা গুণ যাহাই থাকুক, শুধু এই সমস্তেরই জোরে একটা দেশের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় না, অবনতির পতনের ধারা রুদ্ধ করা যায় না। অন্তরাত্মার স্পর্শই জীবন দান করিতে পারে—অন্তরে যদি আমরা মুক্ত হই মহান হই, তবেই রাষ্ট্র হিসাবে সমাজ হিসাবে আমরা পাইব মুক্তি ও মহত্ত্ব।

এই আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য, বল ও মহত্ত্ব ফিরিয়া পাইতে হইলে আমাদের পাশ্চাত্যের ভাবে ধর্ম্ম করিতে হইবে কিম্বা গোঁড়া হিন্দুয়ানী অনুসরণ করিতে হইবে—এই বিশ্বাসও আমরা করি না। পাশ্চাত্য ধর্ম্মের লইয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ ও সুলভ অর্থ, তাহা মানিলে সেই গণ্ডীটুকুরই মধ্যে রহিয়া নূতন নূতন সম্প্রদায় আমরা বাড়াইয়া তুলিব মাত্র; অন্য দিকে গোঁড়ামীর পথে, হিন্দুত্বের প্রাণ হারাইয়া তাহার বাহিরকার রূপ—দেহ ও সাজ-পোষাকটুকু যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ করিয়া রাখিতেই আমাদের প্রয়াস হইবে। ফলতঃ, স্বাধীন চিন্তা, এমন কি জড়বাদের প্রাবল্য একটা অবস্থায় জগতের ক্রমগতির পথে নিতান্ত প্রয়োজনেরই হইয়া দাঁড়ায়। এই রকমের সন্ধিযুগের পরেই দেখা দেয় ধর্ম্মজগতে চিন্তার ও অভিজ্ঞার একটা নূতন সমন্বয়, সকল রকম অনুদারতাবর্জ্জিত অথচ শ্রদ্ধায় ও তীব্রতায় পরিপূর্ণ একটা জগৎ-জোড়া ধর্ম্ম-জীবন—এক সত্যে তাহার অটুট অভিনিবেশ বলিয়া ধর্ম্মের যাবতীয় রূপই স্বীকার করিয়া লইতে তাহার কষ্ট হয় না। জগতের অন্তর-পুরুষ চলিয়াছে এমন একটি ধর্ম্মের দিকে যাহা বিজ্ঞানকে ও ভক্তিকে, নিরাকারবাদকে ও সাকারবাদকে, খ্রীষ্টধর্ম্মকে, মুস্‌লিম্ ধর্ম্মকে, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, অথচ এই সকলের একটিও তাহা নয়। আর আমাদের নিজেদের যেটি ধর্ম্ম তাহা একদিকে অবিশ্বাসের বা

সন্দেহের চূড়ান্ত যেমন দেখাইয়াছে, অন্যদিকে তাহারই মধ্যে পাই আবার বিশ্বাসের বা শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা।—তাহাকে পরম সন্দিগ্ধ বলিতেছি এই জন্য যে তাহার মত এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার বিতর্ক কেহ করে নাই, এমন নূতন নূতন পথে পদে পদে পরীক্ষা করিয়াও কেহ চলে নাই; আর পরম শ্রদ্ধাবান ও আস্তিক বলিতেছি এই জন্য যে জগতের আর কোন ধর্ম্মে এত গভীর উপলব্ধি, অধ্যাত্ম রাজ্যের এত রকমারি ও এমন স্পষ্ট জ্ঞান কেহ দেখাইতে পারে নাই। আমরা বলিতেছি একটা বৃহত্তর হিন্দুধর্ম্মের কথা—এই হিন্দুধর্ম্ম কোন বিশেষ নীতিসূত্র বা কতকগুলি নীতিসূত্রের সমাবেশ নয়, তাহা প্রত্যক্ষ জীবনেরই একটি ধারা বা গতিভঙ্গী; এই ধর্ম্ম অর্থ সামাজিক ব্যবস্থার কোন বিশেষ কাঠামো নয়, তাহা হইতেছে অতীতের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে যে সামাজিক ক্রমবিকাশ তাহারই অন্তরস্থ ভাব; এই ধর্ম্ম কোন কিছুকে পূর্ব্বাহ্নেই অগ্রাহ্য করিয়া রাখে না, তবে প্রত্যেক জিনিষকে উপলব্ধি করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সে চাহে এবং উপলব্ধ ও পরীক্ষিত হইয়া গেলে পর তাহাকে অন্তরাত্মারই প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এই উদার হিন্দুধর্ম্মেই আমরা দেখিতেছি ভবিষ্যতের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই "সনাতন ধর্ম্মের" বহুতর শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি বাইবেল ও কোরাণকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না; কিন্তু তাহার সত্যকার, তাহার অব্যর্থ অভ্রান্ত শাস্ত্র হইতেছে মানুষের হৃদয়ে, যেখানে অনন্তের অধিষ্ঠান। আমাদের এই অন্তরের যত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, সেইখানেই পাইব সকল দেশের সকল শাস্ত্রের প্রমাণ ও মূল, সেইখানেই রহিয়াছে জ্ঞানের প্রেমের ও ব্যবহারের বিধান, কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা ও অনুপ্রেরণা।

সুতরাং আমাদের লক্ষ্য ভারতকে গড়িয়া তোলা, কিন্তু জগতের সেবার জন্য। ভারতে আমরা নেশন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি এই উদ্দেশ্যে। আমরা মানবজাতিকে বলিতেছি, "আজ সেই মাহেন্দ্র সন্ধিক্ষণ উপস্থিত যখন তোমাকে এক স্তর হইতে আর এক স্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, জীবনের শুধু অন্নময় প্রতিষ্ঠান হইতে একটা উচ্চতর বৃহত্তর গভীরতর আয়তনে গিয়া পৌঁছিতে হইবে—মানবজাতি চিরকাল সেই লক্ষ্যেই যে চলিয়া আসিয়াছে। যে সকল সমস্যা মানুষকে এতদিন বিভ্রান্ত করিয়াছে, তাহাদের মীমাংসা হইতে পারে এক অন্তরের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া—সুখের ও বিলাসের সেবায় প্রকৃতির শক্তিরাজিকে নিযুক্ত করিয়া নয়, কিন্তু বুদ্ধিবলের, অন্তরাত্মার বলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে মানুষের স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া, স্থূল প্রকৃতিকে ভিতর হইতে জয় করিয়া। এই ব্রতের জন্য এসিয়ার জাগরণ প্রয়োজন, তাই এসিয়া জাগিতেছে। এই ব্রত ভারত স্বাধীন ভারত মহান না হইলে কখনও উদ্‌যাপিত হইতে পারে না, তাই ভারত আজ তাহার অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা ও মহত্বের অধিকার চাহিতেছে। এই অধিকার তাহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হউক—তাহাতে সমস্ত মানবজাতিরই

উপকার, এমন কি, ইংলণ্ডও সে উপকারের ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

আমরা ভারতকে বলিতেছি, "ভগবান চাহিতেছেন, আমরা আমরাই রহিব, ইউরোপ হইয়া পড়িব না। এতদিন আমাদের চেষ্টা ছিল আর একজনের জীবন ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আমরা নবজীবন পাইব। এখন আমাদের ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নিজেদের অন্তরে জীবনের ও শক্তির উৎস খুঁজিয়া পাইতে হইবে। অতীতকে জানিতে হইবে, উদ্ধার করিতে হইবে, ভবিষ্যতের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য। আমাদের কাজ সর্ব্বপ্রথমে আত্মোপলব্ধি। ভারতের যে সনাতন জীবনধারা ও স্বভাব তাহারই ছাঁচে আমাদের সকল জিনিষ ঢালিয়া গড়িতে হইবে। কর্ম্মযোগীর উদ্দেশ্য তাই দেশের ধর্ম্ম, দেশের সমাজ, দেশের দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবহার, বিজ্ঞান, সকল রকম চিন্তাসম্পদ—যাহা কিছু আমাদের বলিয়া ছিল ও আছে, সে সমস্তেরই অন্তরের সত্য অনুধাবন করিয়া দেখা। নিজের কাছে নিজে আমরা নিঃসংশয়ে যেন বলিতে পারি, 'এই আমাদের ধর্ম্ম।' পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ আমরা করিব, কিন্তু ভারতের চিন্তা, ভারতের জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া; পাশ্চাত্য আমাদের উপর যে দাসত্বের লাঞ্ছন আঁকিয়া দিয়াছে তাহা তুলিয়া ফেলিতে হইবে, পাশ্চাত্য হইতে যদি কিছু আমাদের গ্রহণ করিতে হয় তবে ভারতের উপযোগী করিয়া তাহা লইব। আর আমাদের ধর্ম্ম কি খুঁজিয়া পাইলে, কেবল বাক্যে তাহা স্বীকার করিব না, পরন্তু মনে ও দেহে—আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মায়তনে, আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় তাহা জীবন্ত ও মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিব।"

ভারতের কাজ, জগতের কাজ, ভগবানের কাজ করিবার জন্য যে যুবকমণ্ডলী আজ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে এবং প্রত্যেককেই আমরা বলি, "এই আদর্শ তোমরা ধারণও করিতে পারিবে না—তাহার সিদ্ধি ত দূরের কথা—যদি তোমাদের মনকে ইউরোপীয় ভাবের দাস করিয়া রাখ, যদি জীবনকে কেবল বাহিরের দৃষ্টি দিয়া দেখ। বাহিরের হিসাবে তোমরা কিছুই নও, কিন্তু অন্তরের অধ্যাত্মের হিসাবে তোমরা সবই। এক ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে, সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া দিতে পারে। সুতরাং সকলের আগে, হও ভারতবাসী। তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ উদ্ধার কর। উদ্ধার কর আর্য্যের চিন্তা, আর্য্যের সাধনা, আর্য্যের স্বভাব, আর্য্যের জীবন-ধারা। উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগদীক্ষা। এ সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না, জাগ্রত জীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে। জীবন-ক্ষেত্রে ঐ সকল বস্তু মূর্ত্তিমান করিয়া তোল, তোমরা মহান, শক্তিমান, বীর, অজেয়, নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইবে। জীবন বা মৃত্যু তোমাদিগকে কোন শঙ্কাই আনিয়া দিবে না। দুঃসাধ্য, অসম্ভব—এ সব কথা তোমাদের ভাষায় আর স্থান পাইবে না। অন্তরাত্মায় যে শক্তি তাহাই অসীম অনন্ত—বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও; মায়ের আসন এইখানে,

শক্তি সঞ্চার করিবেন বলিয়াই তিনি পূজার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। তাঁহাতে তোমাদের শ্রদ্ধা অটুট রহুক, তাঁহার সেবা তোমরা কর, তোমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্খা সব তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে হারাইয়া ফেল, তোমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কার দেশের বৃহত্তর অহঙ্কারে, তোমাদের পৃথক পৃথক স্বার্থপরতা সব জগতের স্বার্থে ডুবাইয়া দাও। নিজের ভিতরে শক্তির উৎস উদ্ধার করিয়া আন—তবে আর সব জিনিষই তোমরা অবলীলাক্রমে ফিরিয়া পাইবে—সামাজিক স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, বিশ্ব-চিন্তার নায়কত্ব, ভূমণ্ডলের রাজচক্রবর্ত্তীত্ব।

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

সিন্ধু

দ্বিতীয় তরঙ্গ

নজরুল ইস্‌লাম

হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্ত্তন ?
নিস্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া ?
সর্ব্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে তিলে!
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে। ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা!
হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা বধূর অঞ্চল!

কৌতুকী গো! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই!—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদরেখা!—কে নিশীথে এসেছিল ভুলে'
তব তীরে গর্ব্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে তব
সব দিলে পদে তার ডারি',
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়!
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরাল কঙ্কনের ঘায়!
—গেল চলে নারী!
সন্ধান করিয়া ফের হে সন্ধানী তারি
দিকে দিকে তরণীর দুরাশা লইয়া,
গর্জ্জনে গর্জ্জনে কাঁদ—"পিয়া, মোরি পিয়া!"

বল বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান!
হে "মজ্নুন", কোন্ সে "লায়লী"র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি?—বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন্ রাজ-কুমারীর লাগি? কারে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি?—সারে সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!

ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে উর্দ্ধে অগ্রগতি।

উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
"মাইন্" তোমার চোরা পর্ব্বত নিপুণ!
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে "সাব্‌মেরিণ,"
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন!
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির!
কখন আনিবে জয় করি'—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালা রচি নীচে।
তোমার হেরেম্-বাঁদি শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে।
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার!
বধূ তব দীপান্বিতা আসিবে কখন্
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন পোষা কপোতী-কপোত!
নাচায়ে আদর কর পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্ব্বার!
উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া ওঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চু-পুটে?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তরিকার গুণ!

উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব!—কী তুমি একাকী
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন!

ফিরে চল ভাঁটি টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে !—
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে—আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে !

নিরুদ্দেশ ! শুনে কোন্ আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালী পথে চল একাকী নির্ব্বাক ?
অন্তরের তলা হ'তে শোন কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন,
চাহে তব প্রাণ !
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায়—ব্যথায়—অপমানে !

তারপর, বিরাট পুরুষ, বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ,
বল, 'প্রেম করে না দুর্ব্বল ওরে করে মহীয়ান !'
বারুণী সাকীরে কহ, "আনো সখি সুরার পেয়ালা !"
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোল সব জ্বালা !
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেণা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব, পাগল !
তট-কণ্ঠে ধরি রাখ সেই জ্বালা—সেই হলাহল !

হে বন্ধু হে সখা,
এতদিনে দেখা হ'ল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা !

কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে—সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!

এসো বন্ধু, মুখোমুখী বসি!
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুঁহু পশি
ঢেউ নাই যথা—শুধু নিতল সুনীল!—
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি'।
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে—আমি রব—আর রবে ব্যথা!
সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি,'—
যদি কই
নাই সেথা দুটি কথা বই—
"আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!"

চট্টগ্রাম, ৩১-৭-২৬।

কেলেঙ্কারী

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এমন কিছু সোণাদানা ত' নয়—

...কচুর থানিকটা তরকারি।

"তা ফেলেছে ত' আর কি হবে মা?"

"না মা না, তোমরা সব ছু-চুচ্‌কোর দল—তোমরা চুপ কর। হারামজাদী ফেল্‌বে কেনে তাই শুনি।"

সালিস্ যিনি করিতেছিলেন, রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন।—"তবে তাই যা খুশী তাই কর মা!"

সতীনে সতীনে ঝগড়া। ছোট সতীন এঁটো বাসনের সঙ্গে বাসি কচুর তরকারি খানিকটা ঘাটের জলে ফেলিয়া দিয়াছে। বড়র মুখে হাত দেওয়া দায়।

"যে মুখে বল তুমি দরিদ্র বাহ্মণী, আবার সেই মুখেই বল তুমি চ্যাং মাছের খানি! কত ঢংই না জানো মা তোমরা! আমার কাছে আমার মতন—ওর কাছে ওর মতন.. ..."

মেয়েটা তখন চলিয়া গিয়াছিল—তাই রক্ষা।

কিন্তু ছোট সতীনের কথা বলিবার অবসর ছিল না।—শীতের সকালে উত্তরে বাতাস বয়, পুকুরের জল যেন ঠাণ্ডা হিম হইয়া থাকে। তার উপর এক বোঝা বাসন। বালি দিয়া না মাজিলে কাঁশার গেলাসের দাগ ওঠে না। হাতের চামড়া হাজিয়া যায়—হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কন্ কন্ করিয়া ওঠে।

তবু একবার মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "এই আলুমিনির বাটিটা বালি দিয়ে মাজব দিদি?"

দিদি তখন হুঁকার গুল্ দিয়া দাঁত মাজে। মাজিতে মাজিতে ব্যাজার হইয়া বলে, "বালি দিয়ে না পাথর দিয়ে তা আমি কি জানি না? আমি কি জানি?"

ঠোঁট উল্টাইয়া থুতু ফেলিয়া আবার বলে, "তখনই শীল মা তখনই শীলা,—কে জানে মা তোমার নীলা!"

বলিয়াই চুপ করিয়া থাকে।

জয়া আবার হেঁট মুখে বাসনের গাদায় হাত দেয়। পুকুরের পাৎলা জলে তাহার মুখের চেহারা দেখা যায়। কপালের চুলগুলা বাঁ হাতের মুঠা দিয়া সরাইয়া লইয়া আবার সে বাসন মাজিতে সুরু করে।

বড়-সতীন তাহার মুখ হইতে কালো গুলের থুতু খানিকটা ফেলিয়া দিয়া হাতের ইসারা করিয়া ডাকে, "কে রে ও ছেলেটা! কে রে তুই? দে বাবা ছাগলটাকে দিগ্‌দড়ি দিয়ে ওই খানে। নইলে দেবে হয়ত' এখুনি শেয়ালে খেয়ে। দে বাবা!"

মুচিদের ছেলেটা তেঁতুলতলার দিকে চলিয়া যায়; কথা শোনে না।

"কাকে ডাক্‌চিস্ লা? কে ও?"

বড় বৌ মুখ ফিরাইয়া বলে, "আর দেখ্‌ছ কি মা, মুচিদের ওই ছোঁড়াটাকে এত করে' ডাক্‌ছি ত' ভুলে একবার পিছন্ ফিরুক্......"

বেঁটে-কামিনী শীতের ভয়ে কাপড়ের ফাঁকে মাত্র চোখ দুইটি বাহির করিয়া ঘাটের কাছে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "ওরা ভালো আজ কথা শোনে? ঘুমিয়ে উঠে দরজা খুল্‌তে যাই, দেখি না—ওমা, অভয়ার সেই মরা গরুটাকে কাঁধে করে' নিয়ে আসছে ভাগাড় থেকে তুলে। বলি—তা আমার দরজা দিয়ে কেন্ রে মুখ-পোড়া? বললাম ওই ডোম্‌না খাল্-ভরাকে! তা হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। বাটি বাটি মাংস খাবে আজ এই শীতের দিনে,—কথা আজ ভালো শোনে ওরা কেউ?"

নাক মুখ সিঁটকাইয়া বড়-বৌ ঘৃণায় খানিকটা থুতু ফেলিল। বলিল, "না মা, ঘরের কাছে রয়েছে, বাসি ভাত-তরকারি খারাপ হয়ে গেলেই ডাকি, বলি, ও ডোম্‌নার বৌ নিয়ে যা, ও রুহিতের মা, থালা নিয়ে আয়! দেব এইবার ভাল করে',—মুয়ে নুড়ো জেলে দেব। বলি, ছাগলটা ধান-মাঠে চরছে, দিক্‌দড়ি দিয়ে দে বাছা—নইলে এখুনি শ্যালে ধরবে, তা কে কার কথা শোনে! এত গরব! ছেলেটাকে চিন্‌তেও পারলাম না যে ছাই—ওই সূয্যির জ্বালায়......"

পাকা ধানের মাঠের ওপর সূর্য্য তখন অনেকখানি উঠিয়াছে বটে,—ঠিক্ একেবারে চোখের সুমুখে।

কামিনী বলিল, "শেয়ালের কথা আর বলিস্ না মা! শেয়ালের জ্বালায়—হাঁস ছিল আমার তিন গণ্ডা—এখন সবে পাঁচটিতে ঠেকেছে; তিনটি হাঁসা আর দুটি হাঁসিন্। খদ্দের পাই ত' বেচে দিই।"

মুখ ধুইবার জন্য বড়-বৌ খেজুর গুঁড়ির পাটের উপর গিয়া বসিল। বলিল, "আ! পয়সা কত গাঁয়ের লোকের! হাঁস খাবে! পায়রা পায় না—হাঁস খাবে!"

রোদ পাইয়া কামিনী এতক্ষণে মুখের ঢাকা খুলিল; বলিল, "শীতকাল, এই সময়েই ত' হাঁস খাবার সুখ।"

রাজুবালা ঘাটে জল লইতে আসিয়াছিল, ভি

কলসীটা কাঁকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "সব্বনাশীয়া যে ধান খায়! ধান খেয়ে খেয়ে দিব্যি ভোগা ভোগা গতর হয় কেমন। তুমিও ধান খাও কামিনী পিসি, দেখবে তোমারও অমনি গতর হবে।"

কামিনী বলিল, "আ মর্! পিসি হই যে লা?"

রাজুবালা মুখ ফিরাইয়া কদম গাছের তলা দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়।

মেয়েটা অম্‌নিই—চিরকাল!

'দিদি!"

মুখ ফিরাইয়া দিদি দেখে, ভাত-তরকারির লোভে পুকুরের হাঁসগুলা একেবারে হাতের কাছে আসিয়া চরিতেছিল—জয়া তাহাদেরই একটাকে ঝাপ্‌টাইয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

"ছেড়ে দে—ছেড়ে দে সব্বনাশী! কার না কার হাঁস—ঝেঁটিয়ে এখুনি বিষ ঝেড়ে দেবে, জানিস? হাঁসের নামে নোলায় তোর জল সরলো বুঝি?"

হাঁসটা জয়া ছাড়িয়া দিতেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া সে তাহার দলে গিয়া ভিড়িল। অন্য হাঁসগুলা তখন দূরে একটা শালুক-ঝাড়ের কাছে।

কামিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আ আমার মরণ! অত বড় ধিঙ্গি মেয়ের আক্কেল নেই গা? তা নইলে কি আর সাতছেলের বাপের হাতে পড়ে কখনও?"

গাল দুইটা জয়ার রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া আবার সে আপনমনে বাসন মাজিতে লাগিল।

বড়-বৌ বলিল, "আক্কেল দিব্যি আছে মা, আক্কেল দিব্যি আছে! সতীর বাপের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করবার বেলা ত' বেশ!...ন্যাকা ন্যাকা পেয়াদা,—আসামী ধরতে জেয়াদা! আ মর্ সব্বনাশী! দস্যি! মর্ মর্—গরব দেখে কি হয়!"

জয়ার আরক্ত গালের উপর সজোরে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া বড় বৌ ঘাট হইতে উঠিল।

"নে তাড়াতাড়ি বাসন মেজে ওঠ্ বলছি, ঘরে এখনও বাসি-পাট পড়ে আছে যে কত তার ঠিক নেই!—ওকি! ও আবার কি করছিস্ লা?"

জয়া তাহার শাড়ীর আঁচলটা ঘাটের জলে বেশ ভাল করিয়া ধুইতেছিল। বলিল, "গুলের দাগ ·· ···"

"গুলের দাগ কি লা সব্বনাশী?"

"তোমার কুল্‌কুচু!" বলিয়া জয়া ভিজা কাপড়টা গুটাইয়া লইয়া আবার আর-একটা থালা মাজিতে বসিল।

"কুল্‌কুচু কি তোর গায়ে করলাম নাকি? দেখো দেখো—বদনাম দেওয়া দেখ ছুঁড়ির!"

জয়া তেম্‌নি হেঁটমুখেই জবাব দিল, "না, এম্‌নি পেয়ে গেল দিদি—তুমি যাও।"

কামিনীও উঠিয়াছিল, বলিল, "তা অমন পায় লো পায়—।"

বড়-বৌ কামিনীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "জানো না মা তুমি! হারামজাদী এখুনি কেমন পুটুপুট্ করে' লাগাবে গিয়ে সতীর বাবাকে। সেদিন অমনি দিলে আমার শাড়ীটাকে দু'হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে। আমি আর কিছু বললাম না। বলি, কাজ নেই। দেবে এখুনি শুনলে হয়ত ধুম্‌সো-পেটা করে'। আজ আবার দেখ—শুধু শুধু লাগানি কেমন শোনো—কুল্‌কুচু করে' দিলাম গায়ে! আ মর্! তোর মত কচি খুঁকি ত আর নই,—সাত সাতটা ছেলের মা। গেয়ান্-গম্মি আছে আমার লো—গেয়ান-গম্মি আছে! ... ... বকে' মুখ ভোঁতা হয়ে গেল—নচ্ছার হারামজাদীকে বকে' আর কি করব মা—চল!"

মুচিপাড়ার পাশেই তেঁতুল পুকুরের পাড়ে মাংস সমেত লাল টকটকে আস্ত একটা গরুর হাড় মুখে লইয়া দুইটা কুকুর খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করিতেছিল।

কামিনী একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "অম্‌নি গোটা গোটাই রাঁধে নাকি? কে জানে মা!—এ্যাক্ থু—!"

ঘৃণায় খানিকটা থুতু ফেলিল; তাহার পর হাতে একটা ঢিল লইয়া তাহাদের তাড়াইতে তাড়াইতে কামিনী আগে আগে চলিল। বড়-বৌ পশ্চাতে।

ঘাট হইতে সবাই তখন চলিয়া গেছে। কিন্তু—

জয়ার বাসন মাজা তখনও শেষ হয় নাই। ....

শাড়ীখানি নতুন। গুলের দাগটা হয়ত আর উঠিবে না!—বাসন মাজিতে মাজিতে ঘন-ঘন সে তার শাড়ীখানির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছিল।

হঠাৎ তাহার পিঠের উপর ছোট্ট একটা ঢিল আসিয়া পড়িতেই জয়া পিছন্ ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, নিতান্ত অন্যমনস্কের মত ভজহরি পুকুরের পাড় ধরিয়া ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চলিয়াছে।

জয়া তাহার মাথা ও গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া কাজ করিতে লাগিল।

আবার আর একটা ঢিল!—

এবার ঠিক তাহার মাথায়!

জয়া আবার মুখ ফিরাইল।

ভজহরি আড়-চোখে তাকাইয়া হাসিতেছে.........

জয়াও হাসে। হাসিয়া মুখ নামায়।

কিন্তু তাহার এ-হাসি যেন কেমন কেমন......

দাঁত মাজিবার জন্য রায়দের জামাই ওপারে ঝোপের আড়ালে আতা গাছের একটা ডাল ভাঙিতেছিল। ভজহরি এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। দেখিবা-মাত্র পুকুরের জলে আরও গোটাকতক্ ঢিল ছুঁড়িয়া হাঁস গুলাকে পাড়ে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "যে পুকুরে হাঁস চরবে—বাস্! সে পুকুরের দফাটি নিশ্চিন্তি! বুঝলে জামাই?"

জামাই আচম্কা পিছন ফিরিয়া বলিল, "তা বটে—"

"কিন্তু আতার ডালে দাঁতন ত ভাল হয় না। নিমের ডাল ভাঙলেই ত' পার?"

"তার চেয়ে কুইনিন্ দিয়ে মাজলেই ত হয়!" বলিয়া রসিকতা করিয়া জামাই একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু ভজহরি তখন অনেক দূরে··· ··· ··· ···

আগে নাকি কল্মি-শাকের জঙ্গল ছিল, এখন আর হয় না। তবু সে পুকুরের নাম কল্মি-আড়া।

সেইখানেই মাছ ধরানো হইতেছে। পাঁচজন অংশীদার উপস্থিত। ছেলেয়-বুড়োয় আরও প্রায় জন-দশেক লোক।

মেলা মাছ। ছোট ছোট রুই-কাৎলার পোনা। এক-একবার ঝাঁকে ঝাঁকে উঠিয়া আসে। রূপার পাতের মত ঝক্ঝকে ছোট ছোট মাছগুলি জালে পড়িয়া ছট্ফট্ করে। জেলে-মিন্‌ষে ধরে আর ছাড়িয়া দেয়, বলে,

"ছুটু ছুটু মাছ আজ্ঞে—বড় হোক্।"

অংশীদারেরা সকলেই তখন ওৎ পাতিয়া গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া আছে। বড়ই বা আর কতক্ষণে হইবে! বেলা দু'পহর গড়াইয়া গেছে।

শম্ভু বলিল, "যা হয় তাই কর বাবা! খাব যে কখন্ তার ঠিক নেই।"

পাশেই অনন্ত লাএকের ঘর। পুকুরে জাল ফেলিবার শব্দ পাইয়া, টপ্ করিয়া সে তাহার ভাঙা প্রাচীরের উপর ডিঙাইয়া উঠিয়া ঝুপ্ করিয়া এপারে আসিয়া নামিল। সাদা ধপ্‌ধপে পরিষ্কার গায়ের রং—হাঁপানীর রুগী। বাঁশের লাঠিটি হাত হইতে নামাইয়া সে বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বুকের পাঁজরাগুলা দপ্ দপ্ করিয়া উঠা-নামা করিতেছিল; দেখিলে মনে হয়—এখনই বা যায়! কিন্তু যায় নাই। ঠিক্ এম্নি করিয়াই সে আজ আটটি বৎসর বাঁচিয়া আছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফু ফু করিয়া নাকে মুখে নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটুখানি স্থির হইল। তাহার পর ডাগর ডাগর চোখ দুইটি তাহার তুলিয়া বলিল, "আগোপুনার

আমিই। কল্‌মি-আড়া থেকে একটি চুনো-পুঁটি কই যাক্ দেখি চুরি! সব-বেটা জানে যে এই অনন্ত শম্মা বসে বসে ধুঁকছে হয়ত সারারাত। যাব আর অম্‌নি তেরে রে রে! তার চেয়ে কাজ নেই বাবা!—ঘুম কোথা পাবে? ঘুম নেই .. .. সেই কুঁক্‌ড়ো-ডাকা রাত পর্য্যন্ত... ...ফু—!

আবার তাহার দম উঠিতে লাগিল।

"বাস্! পাঁচ ভাগীতে পাঁচটি! তাহ'লেই আমার হাতা-চড়্‌চড়ি খুব! অন্ন আমার পিস্তত!—নাঃ! রোদে বসি, যাই! বাতাসের চোটে একেবারে হাওয়া গাড়ী ছুটিয়ে দিলে!"

লাঠিটি হাতে লইয়া গাছের তলা হইতে অনন্ত একটু খানি সরিয়া বসিল।

নিশু ভট্‌চাজ্ বলিল, "ময়নাবুনির ওষুধ খেলে না কেন অনন্ত, ধম্মরাজের ওষুধ?"

ঔষধের নাম শুনিয়া রাগে যেন অনন্ত হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"ধেৎ তেরি ওষুধ কাঁহাকা! ওষুধের নাম করিস না আমার কাছে—ওষুধ!"

তাহার পর ডান হাত দিয়া ঠ্যাঙাটাকে মাটিতে ঠুকিয়া বলিল, "ঠাকুর-দ্যাবতার ইয়ে করি আমি,—জানিস? সব বেটা-বেটিকে চেনা আছে আমার! পঁচিশ গণ্ডা মাদুলী নিয়েছিলাম, আর না হবে ত' হাজারো রকমের ওষুধ। কিন্তু ব্যারামের কই এতটুকু টল্-বেটল্ হলো?—সেই যে-কে সেই! শেষকালে রেগে-মেগে দিলাম ছিঁড়ে একদিন মাদুলিগুলো সব। পটাপট্ ছিঁড়েছি আর ফেলেছি এই কল্‌মি-আড়ার জলে। বলি,—বাস্! এইবার ধীরে ধীরে একদিন ফুঁকে দিলেই খালাস! শিঙের শব্দ শুনে আসিস যেন তোরা সব—বুঝলি নিশু? ফু—!"

বলিয়া অনন্ত আবার দম টানিতে লাগিল।

পাশ দিয়া একটা কালো রঙের কুকুর পার হইয়া যাইতেছিল, অনন্ত তাহার হাতের ঠ্যাঙাটি দিয়া তাহার পিঠের উপর এক ঘা বসাইয়া দিতেই কুকুরটা কোমর বাঁকাইয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া পলাইল।

অনন্ত বলিল, "আর একটু হলেই বাছাধন—চণ্ডীচরণ! সে বছর সেই বড় লাঠিটা থাক্‌তো তখন হাতে। কার একটা ছেলেকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে এমন এক বাড়ি মেরে ফেললাম ওদের ওই ল-বৌএর হাতে, যে একেবারে চেড়েক্-ভেঙেং! আঙুলের গিঁট্‌গুলো সব দড়ির মত ফুলে উঠলো মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে। বাস্! সেই থেকে এই ছোট লাঠি। ফু—।"

অনন্ত তাহার হাতের লাঠিটি তুলিয়া একবার দেখাইল।

কিন্তু তাহার নজর ছিল জেলের দিকে। জালটা তখন সে পাড়ে তুলিয়া ঝাড়িতে সুরু করিয়াছে।

অনন্ত উঠিল। কোমরে-কাঁকালে হাত দিয়া, দু'বার বসিয়া, দু'বার উঠিয়া, অতি কষ্টে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া বিড়ালের মত ছো মারিয়া দাঁড়াইল।

"ফেলিস্‌নে—ফেলিস্‌নে, ওটা তোর পোনা নয় বাবা, ওটা কাল্-বাউস্।"

টপ্ করিয়া অনন্ত তাহার জাল হইতে মাছটিকে এক রকম জোর করিয়াই টানিয়া ছাড়াইয়া লইল।

জেলে ত' রাগিয়া আগুন!

"জিউ দিতে পারি ঠাউর, মাছ দিতে পারি না।"

মাছটা সে কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত!

কোঁচড়ের তলায় মাছটি তাড়াতাড়ি গুঁজিয়া লইয়া অনন্ত তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিল।—"বেশ বাপু বেশ, দিস্‌নে তুই। ভারি ত' একটা আঙুলের মতন মাছ......'

অনন্ত ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে শ্যামাশরণ বলিয়া উঠিল, "দিলি না কেন অম্‌নি জাল দিয়ে এক সাপ্‌টি মেরে ওকে। জীবনে আর কেয়টের পাশ ঘিঁস্‌তো না কোনো দিন।"

কথাটা অনন্তর কানে গিয়াছিল।

বাজিল নিশ্চয়ই!—মরণাপন্ন রুগীর বড় বাজে!

কোঁচড় হইতে ছোট মাছটি সে ধীরে ধীরে বাহির

করিয়া শ্যামাশরণের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "নে তোর মাছ!"

বলিয়াই সে হাঁপানীর টানে বসিয়া পড়িল।

শিবু চাটুজ্যে পাশেই বসিয়াছিল।

ব্যাপারটা ভাল হয় নাই দেখিয়া সে যেন নিজেই একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল। মাটি হইতে আধ-মরা পোনার বাচ্চাটি তুলিয়া লইয়া অনন্তর হাতের মুঠায় গুঁজিয়া দিয়া বলিল,

"না রে না—রাগ করে না, ছিঃ! তোকে বলেনি। তোকে বলেনি।"

অনন্তও এতক্ষণে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। মাছটা সে আবার তাহার আঁচলে গুঁজিয়া বলিল, "না—। হুঃ! ছুটো বিয়ে করে না হয় আট শ' টাকাই পেয়েচিস, আমার না হয় আটটা পয়সা নাই—আমি না হয় গরীব! তাই বলে' জেলের মার খাব? আর তুই কিনা বসে' বসে' হুকুম দিবি? এঁ্যা—!"

খুব জোরে জোরে কথা কয়টা বলিয়া অনন্তর বুকের পাঁজরাগুলা একেবারে শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া যাইতে লাগিল। চোখ ছুইটাও অসম্ভব রকম বড় হইয়া পড়িয়া ছিল,—এবং রাগে ও অভিমানে তাহার সেই ছুইটা বিস্তৃত চোখের কানায় কানায় তখন জল দেখা দিয়াছে।

অনন্ত একবার উঠিল, আবার বসিল। কোমরে হাত দিয়া আবার একবার দাঁড়াইয়া, আবার বসিল। মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝা গেল—দম লইতে তাহার অত্যন্ত যাতনা হইতেছে। হঠাৎ এতখানি রাগিয়া উঠা হয়ত ভাল হয় নাই।

তবু সে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। শ্যামাশরণের মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "জয়ীকে বিয়ে যে তুই করলি সাতটা ছেলের বাপ হয়ে—তার গোঁড়ায় কে তাই শুনি? ভেতরের রহস্যি ত কেউ......"

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শ্যামাশরণ তাহাকে কতক্-বা চোখ টিপিয়া, কতক্-বা ধমক্ দিয়া চুপ করাইয়া দিল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব হয়েছে! খুব বাহাদুর! চুপ কর্ হতভাগা চুপ কর্,—নইলে মরে' যাবি—এক্ষুণি মরে' যাবি।"

অনন্ত পুকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। বলিল, "হুঁঃ! মরে যাবি! মরছি যে আজ আট বছর, তাই মরে যাবি!"

... ...

জেলে আসিয়া মাছ ভাগ করিল।

"এই ডগা-পোনা গুলি অন্য বছর আরও বড় হয়। কল্‌মি-আড়ার মাছের মিষ্টি কত ঠাউর—!"

হাত ছুইটা মাটিতে পাতিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া বসিয়া বসিয়া অনন্ত মাছের ভাগ দেখিতেছিল। বলিল, "হরিপদর ভাগটা কম হলো। দে আর একটা ছোট মাছ দিয়ে দে! দিলেই ছুটি।"

কিন্তু জেলে সে কথায় কান দিল না, বলিল, "লেন সব, আপন-আপন ভাগ তুলে নিয়ে চলে' যান ঝট্‌পট্!"

কিন্তু যাইবার সময় প্রত্যেকেই একটি করিয়া ছোট মাছ অনন্তকে দিয়া গেল।

শ্যামাশরণ মাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া আবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল; আর একটা মাছ সে অনন্তর কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "মাছ মাছ করছিস, নে—মাছইখেগে যা বাস!"

... ...

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—শ্যামাশরণের উপর রাগ তাহার একটুখানি লাগিয়াই রহিল। জয়ীকে বিবাহ করিবার ভিতরের 'রহস্যি'টুকু প্রকাশ করিবার লোভ সে কোন প্রকারেই সাম্‌লাইতে পারিল না। মরণের পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার মত গুপ্ত সঞ্চিত ধনের মধ্যে বুঝি বা তাহার এইটুকুই ছিল।

প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু বিশেষ কাহারও কাছে নয়—

খাওয়া-দাওয়ার পর শিবু চাটুজ্যে রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা কাটা শালগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া আরাম করিতেছিল। অনন্ত বলিল, "এই যে!"

বলিয়া তাহার কাছে গিয়া বসিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া আসল কথাটি সে বলিতে সুরু করিল—

"কিন্তু কারও কাছে বলো না তুমি ভাই, কাজ কি এসব জানাজানিতে?......

"বসে' বসে' ধুঁকছিই ত সারারাত! তারপর বলি, শব্দটা কিসের শোনাই যাক্! মেয়ে-লোকের কান্না হে!—পষ্ট শুনলাম, হুঁকরে হুঁকরে কাঁদছে—সদানন্দদের খামারে—পাকা ধানের বড় বড় দুটো পালুইএর ঠিক মাঝখানে।

"অন্ধকারটা কেটে তখন ঠিক চাঁদ উঠ্‌ছে। রাত বেশি না,—হদ্দ পহর-দেড়েক।

"লাঠি নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে গেলাম......

"ভাঙা পাঁচিরের ওপারে সবই ত' দেখা যায়। দিব্যি সাদা ফট্‌ফটে কাপড় পরে'—আব্‌ছা অন্ধকার হলেও চিনতে পারা গেল ঠিক্—জয়ী কাঁদছে। আর-একজনকে চিনতে একটু দেরি হলো। পিছন ফিরে বসেছিল,—চিনলাম গলার আওয়াজে। বলে, 'করেছিস্ কি সব্বনাশ! ওষুধ এনেছিলাম, ধাঁ করে নষ্ট হয়ে যেতো।'

"অবাক্! ভাই অবাক্! গালে হাত দিয়ে দাঁড়ালাম। বলিহারি যাই শ্যামা! তোর পেটে এত বিদ্যে!

"জয়ী তবু কাঁদতে থাকে।—ধীরে ধীরে চাঁদ উঠলো। হুঁস্ নাই! ধব্‌ধবে' চাঁদের আলো খড়ের গাদা ডিঙিয়ে ওদের গায়ে গিয়ে পড়লো—তবু হুঁস্ নাই! হাত বাড়িয়ে জয়ীকে ধরতে গেল—

"হয়েছে কি তোর? এত কান্না কিসের? আমার নাম করিসনি ত?'

"জয়ীর কী রাগ! কাঁদতে কাঁদতে শ্যামার হাতটাকে সে ঝট্‌কে ফেলে দিলে,—'যাও!'

"শ্যামা আবার বলে, 'আমার নাম করিসনি ত?'

"জয়ী ফুলে' ফুলে' শুধু কাঁদে,—জবাব দেয় না।

"শ্যামা আবার তাকে ধরতে যায়—জয়ী আবার সরিয়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে শেষে বললে, 'জোর করে তুমি এইটি .....বাবারে! আমি কি করি এবার? বিষ এনে দাও—খাব আমি।'

"শ্যামা কিন্তু শয়তান ছোকরা! বলে কি না, 'জোর করে বললে লোকে শুনবে কেন? খবরদার আমার নাম করিস না কাউকে!"

"জয়ী আবার রেগে উঠলো, 'না—! সব্বনাশ করেছ আমার .....বলেই সে আবার হুঁকরে হুঁকরে কাঁদতে লাগল।

"শীতে আমার তখন কাঁপুনি ধরেছে। বুঝলে শিবু? হাঁপানীর রুগী, আর কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকি বল? ভাবলাম, সাড়াশব্দ করে' একবার বাছাধনকে টের পাইয়ে দিই! ওদের ওই পাশের পুকুরটায় সদানন্দর রাজহাঁস-গুলো থাকতো তখন। হঠাৎ সেগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে' উঠলো।—যেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে' ওঠা—বাস্! সড়াচ্ করে' কে কোন্ দিকে উধাও! আমি ত' না চাইলাম বাট্—বুঝলে ভাই শিবু, আন্দাজি হাঁকলাম, 'বলি, কে হে! শ্যামাশরণ নাকি?'

"আর যায় কোথা! শ্যামাশরণ কাছেই কোথা লুকিয়েছিল, ভাঙা পাঁচিরটা টপ্‌কে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চুপি চুপি বল্লে, 'অনন্ত! অনন্ত! আয় ভাই —আয়, আয়, আয়... !'

"বাস্! সে দিনের মত ওইখানেই ত হয়ে গেল চুপ্। কিন্তু আমি চুপ্ করলে কি হবে? ধম্মের ঢাক—গুড়ুগুড়ু করে' আপনিই বাজে! ওদিকে জয়ীর মা-মাগী আবার আর-এক শয়তান! কেউ এতটুকু নামগন্ধ টের পেলে না—শ্যামাশরণকে কি করে যে রাজি করলে ভাই কে জানে!

"পট্ করে কোন্ ছাঁকে যে বিয়েটা সেরে দিলে—বাস্!

"দেখ্‌লে না, বিয়ের পরেই সেই ছেলেটা হলো? হয়ে মরে গেল। যাক্‌—। একথা কাউকে বলতাম না আমি, তবে দেখলে না সেদিন, ওর টেংরি দেখলে না? জেলেকে বলে কিনা—মার্‌ এক-সিপ্‌টি তুই..."

অনন্ত প্রাণ ভরিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

শিবু চাটুজ্যে বলিল, "থাক্‌, আর এ-কথা জানাস্‌ না কাউকে!"

"জানাতাম না ত',—তোমাকেই কি বলতাম নাকি? জানে? কই এতদিনের ভেতর পাখ-পক্ষী কেউ জানে? তবে ওই সেদিনের সেই···"

হুঁকা টানিতে টানিতে হরিপদ সেই দিকেই আসিতেছিল,—কথাটা মাঝপথেই বন্ধ হইয়া গেল।

হরিপদ একটা সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, বলিল, "এমাসে একটা পাকা ভোজ আছে হে! জীবা নন্দ ছেলের অন্ন-প্রাশন আছে পনরই।"

অনন্ত সোৎসাহে লাফাইয়া উঠিল, "তাই নাকি?... আচ্ছা এ-মাসটা ত' গেল,—ও-মাসে?"

তাহার পর সম্বৎসরের মধ্যে কোথায় কাহার বাড়ীতে কি-সব কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা আছে তাহারই হিসাব চলিতে লাগিল।

সেদিন এক গাদা বাসন কাঁধে লইয়া পুকুরের ঘাটে জয়া মাজিতে যাইতেছিল,—রোজ যেমন যায়।

মুচিপাড়ার মাথার উপর সূর্য্য তখন সবে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

আমগাছের তলায় অতুল দাঁড়াইয়াছিল। কাছে যাইতেই চুপি চুপি বলিল, "এই নে জয়া, তোর মা দিয়েছে এই টাকা দুটি—।"

টাকা দুইটি সে তাহার হাতে দিতে যাইতেছিল।

পথে দাঁড়াইয়া জয়া বলিল, "না আমি নেব না টাকা,—ফিরে' দিও তুমি।—একজোড়া রুলী দিতে বললাম, তা হ'লো না—দুটো টাকা! টাকা নিয়ে কি করব আমি?"

"কি আবার করবি? নিয়ে যা!" বলিয়া অতুল টাকা দুইটি আবার তাহাকে দিতে গেল।

টাকা সে কিছুতেই লইবে না! জয়া ঘাটের দিকে আগাইয়া চলিল।

কদমতলার কাছে গিয়া আবার কি ভাবিয়া জয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "দিয়ে যাও অতুল দাদা!"

হাসিতে হাসিতে অতুল ফিরিয়া গিয়া বলিল, "নে—!"

জয়া বলিল, "দুটো হাতই এঁটো আমার,—ওইখানে ফেলে দাও।······না, না, চাবির এই রিংএর সঙ্গে বেঁধে দাও পিঠের আঁচলে।"

জয়া পিছন্‌ ফিরিয়া দাঁড়াইল। আঁচলের খুঁটে টাকা দুইটি বাঁধিতে গিয়া অতুলের হাত দুইটি থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। চারিদিকে কোথাও একটি জন প্রাণী নাই······

খুঁটের গিঁটটি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে জয়ার পিঠের উপর হঠাৎ একটা চিম্‌টি কাটিয়া ফেলিল।

জয়া কিছুই বলিল না, ঘাড় ফিরাইয়া একটুখানি মুচ্‌কি হাসিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অতুল কিন্তু না পারিল কিছু বলিতে, না পারিল চলিয়া যাইতে,—হতভম্বের মত সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অতগুলা বাসন মাজিতে একটুখানি সময় লাগে—।

জয়া কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া দেখে, হুলুস্থুল কাণ্ড!

শ্যামাশরণ রকের উপর বসিয়া তামাক টানিতেছিল। একদিকে বড়-বৌ, একদিকে কামিনী-পিসি,—এদিক ওদিক পাড়ার আরও দু'চারটা মেয়ে আসিয়া জড় হইয়াছে।

বড়-বৌ বলিল, "দেখ দেখ সব্বনাশীর খুঁটের পানে তাকিয়ে দেখ,—কানা ত' হওনি এখনও!"

শ্যামাশরণ দেখিল—

বাসনগুলা জয়া রান্নাঘরে রাখিতে যাইতেছিল, চাবির রিংএর সঙ্গে টাকার মত কি যেন বাঁধা রহিয়াছে স্পষ্টই দেখা গেল।

শ্যামাশরণের হুঁকা টানা তখন বন্ধ হইয়াছে। এদিক ওদিক বারকতক চাহিয়া হুঁকাটা সে দরজার পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "বটে—। দেখেছ ত' ঠিক?"

বড়-বৌ বলিল, "জানি না। ঠিক বেঠিক তোমার ওই পিসিমাকে জিজ্ঞাসা কর। সতীনের বাটিতে কে নাকি কোথা গু গুলে খেয়েছিল—সতীনের কথা বিশ্বেস হবে কেন?"

পিসিমা বলিল, "হ্যাঁ বাবা, দেখলাম যে আঁয়া চোখের ছাম্‌নে! তা নইলে একথা কি আর সাধ করে' কেউ......ছি, ছি, সকল-খাকী! কর্‌লি কি তুই?"

আরও দু'একটা মেয়ের ছি ছি শব্দ কপাটের আড়াল হইতে শোনা গেল।

শ্যামাশরণ তাহার পায়ের চটি জুতা একটা হাতে লইয়া উঠিল।

সুমুখে উঠানেই দু'জনের মুখোমুখি।

পট্ করিয়া জয়ার পিঠের উপর এক চটি বসাইয়া দিয়া শ্যামাশরণ বলিল, "টাকা কোথায় পেলি তাই বল্—!"

জয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সকলের মুখের পানেই একবার তাকাইল।

জবাব দিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া শ্যামাশরণের রাগ যেন আরও চাপিয়া গেল, এইবার তাহার মাথার উপর আর এক জুতা বসাইয়া দিয়া বলিল, "হারামজাদী—! মুখ পুড়িয়ে দিলে আমার। বল্—এখনও বল্‌ছি—বল্!"

জয়ার চোখে জল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখখানা তখন হিঙুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, "যেখানেই পাই। তোমার কি?"

এবার আর শ্যামাশরণের অবিশ্বাসের কিছুই রহিল না, জুতা দিয়া মারিতে মারিতে ঘাড়ে ধরিয়া জয়াকে সে একেবারে বাঁধানো রকের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেল—

"বেরো হারামজাদী, এক্ষুণি বেরো আমার বাড়ী থেকে—দূর্ হ'!"

মুখ দিয়া রাগে আর তাহার বেশি কিছু বাহির হইতেছিল না।—মনে হইতেছিল কথাগুলা তাহার পেট হইতে মুখে আসিয়া কোথায় যেন আটকাইয়া যাইতেছে।

বড়-বৌএর ছেলে মেয়েগুলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল। কোলের মেয়েটা মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কামিনী-পিসি বলিল, "মারিসনে বাবা, মারিসনে! বেশি কেলেঙ্কারী বাড়াস্ নেকো আর! দূর করে' তাড়িয়ে দে ঘর থেকে। আ-মর্ সব্বনাশী! সুখে থেকে ভূতে কিলোলো তোকে!"

কিন্তু এত মার খাইয়াও জয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিল না, মুখ দিয়া একটি কথাও তাহার বাহির হইল না। চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা দর্ দর্ করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল মাত্র।

ধীরে ধীরে সদর দরজা দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গত রাত্রি হইতে একটা হাঁস তাহার ঘরে ঢুকে নাই,—ঝুঁঝ্‌কি রাত থাকিতে কামিনী-পিসি আজ তাহারই খবরদারীতে বাহির হয়। তাহা না হইলে এসব কাণ্ড স্বচক্ষে সে আজ দেখিল কেমন করিয়া?

এঁটো বাসনের গাদা দরজায় নামাইয়া অতুলের সঙ্গে জয়ী পোড়ারমুখী কখন্ যে ঠিক তাহার খামারের ভিতর গিয়া ঢোকে—পিসি তাহা দেখে নাই। দেখিল যখন—লজ্জার কথা..... সে সব বলিতে নাই। তাহার

পর হাসিতে হাসিতে গলা ধরাধরি করিয়া কেমন করিয়া যে দুজনে তাহারা বাহির হইয়া আসে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কতক্ষণ ধরিয়া তাহাদের কথা হয় এবং কেমন করিয়া টাকাকয়টি অতুল তাহার খুঁটে বাঁধিয়া দেয়—এই সব কথাই আবার আর একবার ভাল করিয়া হইতেছিল।

জয়া যে সকলের পশ্চাতে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ টেরও পায় নাই।

ডাকিল, "দিদি!"

বড়-বৌ পিছন্ ফিরিয়া দেখে, জয়া।

"ভাঁড়ারের চাবিটা ছিল—" বলিয়া ঝন্ করিয়া চাবিটা তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া জয়া ছুটিয়া পালাইল।

ছোট গ্রাম। কথাটা কিন্তু বড়। কাজেই এই বড় কথা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইতে বেশি দেরি হইল না।

শুনিয়া অবধি অতুলের কাঁপুনি বাড়িল।—ঠিক যেন জ্বর আসিয়াছে!

জয়াকে জিজ্ঞাসা করিলে কোনও জবাবই পাওয়া যায় না। বলে, "যা তোরা সব যা—। বেরো আমার সুমুখ থেকে।"

অপরাহ্ণ বেলায় অতুলকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছিল।

প্রথমে সে লজ্জায় আসিতে চায় নাই। তাহার পর আসিল। পাৎলা সিপ্‌সিপে ফর্সাপানা বচর পঁচিশের এক ছোকরা!

রাস্তার ধারে শালগাছের সেই গুঁড়িটার উপর জন চারেক্ লোক বসিয়া। শ্যামাশরণ উপস্থিত। তাহারই পাশে মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া অনন্ত হাঁপাইতেছিল।

সারদা বলিল, "নে রে অতুল, মা-কালীর ফুল-বেল পাতা হাতে নিয়ে বল্—যা ঘটেছিল ঠিক্ সত্যি সত্যি বলে' ফেল্। ভয় নেই—কেউ কিচ্ছু বলবে না তোকে।"

সুমুখেই কালী মন্দির।

কাঁপিতে কাঁপিতে অতুল গিয়া কালীর বেদী হইতে ফুল ও বেলপাতা হাতে লইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সারদা বলিল, "বল্ এই ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে। মিছে কথা বলিস্ ত' কুষ্ঠব্যাধী হবে, তা মনে রাখিস্ কিন্তু। টাকা দিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ দিয়েছিলাম—দুটি টাকা।"

"কেন?"

"আমাদের বৌ ওর কাছে ধার নিয়েছিল।"

"আর—?"

"আর কিচ্ছু না। আমার কোনও দোষ নেই। আমি নিৰ্দ্দোষী।"

কথা কয়টা বলিয়াই অতুল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনন্ত আর থাকিতে পারিল না। ঘাড় উঁচু করিয়া শ্যামাশরণের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "তুইও ঠিক এই কথাই বল্‌তিস্। সেই সেদিন কেউ যদি শুধোতো তোকে?"

শ্যামাশরণ হেঁটমুখে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

হাসিতে হাসিতে অনন্ত তখন উৰ্দ্ধশ্বাসে দম টানিতেছে—।

পাঁক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

পট্‌লি কদিন আর ঘর থেকে বেরোয় না।

বলে, "দেখি, কিসে তোর সোয়াস্তি হয়! ঘর থেকে আমি এক পা বাড়াব না ; পারিস ত রোজগার করে এনে খাওয়া, না পারিস উপোষ করে মর্! আমার ত বাঁচা মরা দুইই সমান।"

হাবা বিষ্ণু কথা কয় না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। মুখ দেখে তার খুশী হয়েছে কি দুঃখী হয়েছে কিছুই বোঝা যায় না। চুপ করে সে চৌকাঠের কাছে বসে বসে শুকোয়।

সত্যিই কদিন ধরে উপোষ চলেছে তাদের। হয়ত হাঁড়ি-কুঁড়ি হাৎড়ালে যাহোক করে উনুনে হাঁড়ি চড়ান চল্‌ত ; কিন্তু পট্‌লির পণ সে রাঁধবে না। বলে, "বড় যে ভদ্দর লোকের মেয়েদের দোহাই পাড়তিস্—ভদ্দর লোকের মেয়েরা পরপুরুষের সামনে বেরোয় না, কারুর সাথে কথা কয় না, হাসে না,—তারা কি দুবেলা গতর খাটিয়ে রোজগার করে এনে সোয়ামিকে খাওয়ায়! তারা প্যায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকে। তাইত এখন ভদ্দর ঘরের মেয়ে হয়েছি, এখন সাম্‌লা।"

বিয়ে হওয়ার পর থেকেই হাবা বিষ্ণু তার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী সতীর মহিমা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পট্‌লিকে উপদেশ দিয়ে আস্‌ছে। এবং কিছুদিন আগে যার তার সামনে হেসে কথা কওয়ার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে ভদ্র ঘরের মহিলাদের দৃষ্টান্ত সে দিয়েছিল বটে। কিন্তু পুরোপুরি ভদ্রলোকের মেয়ে হওয়ার ফলাফল সম্বন্ধে সে অত বিশেষ করে ভেবে দেখেনি।

তবে এবারের উপোষের পালার সূত্রপাত ওই কথায় নয়। কোথায় যে সূত্রপাত তা নির্ণয় করাও কঠিন। হাবা বিষ্ণুর কাছে সব চেয়ে দুর্ব্বোধ মনে হয় এই তার রূপসী স্ত্রীটির খেয়াল। কেন যে সে হঠাৎ একদিন বেশ-ভূষায় অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে স্বামীকে একেবারে তাচ্ছিল্য করে অত্যন্ত চপল ভাবে বেহায়াপনার চূড়ান্ত করে বসে ও তার পরদিন হঠাৎ কঠোর বৈরাগ্যভরে সমস্ত সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে ধর্ম্মে মন দিয়ে স্বামী-সেবার ও কৃচ্ছ্র-সাধনের পরাকাষ্ঠা দেখায় ; কেন যে সে একদিন হেসে সব দুঃখ কষ্ট নিন্দা উড়িয়ে দেয় ও আর একদিন অকারণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তা বিষ্ণু ভেবে পায় না।

বিয়ে হওয়া ইস্তক তাদের খিটিমিটির বিরাম নেই। ঘটককে অনেক টাকা কবুল করে ও দূর সম্পর্কের পিসের গলগ্রহ মেয়েটাকে সাধ্যাতীত ঘুষ দিয়ে উদ্ধার করে প্রথম ফুলশয্যার রাতেই তার আফ্‌শোষের সীমা ছিল না। মেয়েটা এতবড় হবে সে আশা করে নি এবং তার স্বল্প বুদ্ধিতেও মেয়ের এত রূপ ভাল বলে মনে হয় নি। সেই রাতেই এত বড় সমর্থ রূপসী মেয়েকে সামলাবার দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হয় নি। তার ওপর পট্‌লি প্রথম রাতেই তাকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, "আর কাছে সরে আসতে হবে না ; গায়ে যা গন্ধ!" তা সত্ত্বেও বিষ্ণু ভাব করবার চেষ্টা করায় তার একটা হাত মুচড়ে দিয়ে পট্‌লি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তার পরদিন হাবা বিষ্ণু প্রকাশ্যে ঘটকের হাত ধরে এমন করে সুন্দর সমর্থ মেয়ের সাথে বিয়ে দেবার জন্যে উচ্চস্বরে রোদন করেছিল।

তখন বিষ্ণুর থাকবার মধ্যে ছিল পৈতৃক কটা থালা-ঘটি ও মায়ের কটা রূপোর গয়না। এখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু পা দুটোও তখন সক্ষম ছিল। মিস্ত্রীর জোগাড় দিয়ে যা হোক্ কিছু রোজগার তার তখন হ'ত।

তারপর একদিন উঁচু ভারা থেকে পড়ে পায়ে চোট খেয়ে পা দুটো তার শুকিয়ে দুমড়ে ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হয়ে গেল। থালা-ঘটি-গয়না বেচে যতদিন চলবার চল্‌ল। তারপর আর চলে না। পট্‌লি নিজে রোজগার করতে বেরুল।

সেই থেকে পট্‌লির রোজগারেই সংসার চলে। তা ছাড়া আর উপায়ও নেই। কিন্তু রূপসী স্ত্রী সব সময়ে চোখে চোখে না রাখতে পারায় বিষ্ণুর অসোয়াস্তির আর অন্ত নেই —। পট্‌লি কাজে গেলে ঘরে বসে বসে অদৃশ্য পট্‌লির আচরণ সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম কল্পনা করে তার মন ক্ষোভে ও ঈর্ষার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। নিজের শুকনো অকর্ম্মণ্য পা দুটোকে অভিসম্পাত দেয়; এক একবার সবার অলক্ষ্যে সে চেষ্টা করে দেখে অকর্ম্মণ্য পা দুটো কোন রকমে খাড়া করা যায় কিনা। কঠিন পরিশ্রমে সে ঘেমে ওঠে; কিন্তু শিথিল অক্ষম পা দুটো ন্যাকড়ার মত লতিয়ে পড়ে। নিরুপায় নিষ্ফল ক্রোধে তার সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। দাঁতে দাঁতে পিশে নিঃসাড় পা দুটোর ওপর সে ক্ষ্যাপার মত যা হাতে পায় তাই দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে—অচেতন পায়ে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হতাশ ভাবে সে হাল ছেড়ে দেয়।

এক একদিন তার ধারণা হয় তার হাতের কাছেই কোন সাধারণ জিনিষের মধ্যে এ নিদারুণ রোগের ওষুধ আছে—হয় ত কেউ এখনও তা পরীক্ষা করে দেখে নি।

গোপনে সে খানিকটা মাটির ঢেলা সশ্রদ্ধায় চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

অনেকক্ষণ বাদে অত্যন্ত সন্তর্পণে পাটা নাড়বার চেষ্টা করে। হয় ত আবার লুপ্ত শক্তি ফিরে এসেছে!—পা নড়ে না।

সে হতাশ হতে চায় না, আরও অপেক্ষা করে—এক দিন দুদিন কেটে যায়—ক্রমাগত সে পা নাড়বার চেষ্টা করে, পায়ে চিম্‌টি কেটে দেখে।

তারপর একদিন হয়ত পট্‌লি জিজ্ঞাসা করে,

"ওমা কুপি ভরা যে তেল ছিল গো, কি হ'ল অত কেরোসিন তেল?"

বিষ্ণু উত্তর দেয় না। কিন্তু গন্ধও চাপা দেওয়া যায় না।

দুরাশা করে সে সমস্ত কেরোসিন তেলটা পায়ে মাখিয়েছে।

কিছু তবু হয় না।

কখনও তার মনে হয় একটা দৈব ওষুধ সে পাবে—কত লোক ত পায়! ভক্তিভরে সমস্ত দেবঠাকুরদের প্রণাম করে সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে। স্বপ্ন হয়ত দেখে কিন্তু সকালে কোন ওষুধের কথা সে স্মরণ করতে পারে না। তবুও বালিশের তলাটা একবার খুঁজে দেখে—একবার ঘরের চারিদিকে চায়! ওষুধের মত কিছু দেখা যায় না।

বালিশের তলাটা আবার ভাল করে দেখে। খানিকটা নোংরা চাপ-বাঁধা তুলো ছেঁড়া তেলচিটে বালিশের ফুটো দিয়ে বেরুবার উপক্রম করেছে। সেইটুকু বার করে নিয়ে পট্‌লিকে বলে-কয়ে অনেক অনুরোধ করে তামার মাদুলী আনিয়ে ভেতরে পুরে হাতে বাঁধে।

তবু পায়ের পঙ্গুতা দূর হয় না।

সারাদিন ঘরে একলা বসে বসে মাথায় অদ্ভুত সব কথা ওঠে। খড়ের চাল থেকে একটা কুটি খসে পড়ে। কে জানে হয়ত এই দেবতার দেওয়া ওষুধ! কে বলতে পারে?

কুটিটি পায়ে বুলিয়ে মাথায় ঠেকায়, দাঁত দিয়ে একবার কাটে। ন্যাতার মত পা দুটো তবু কিছুতে বশে আসে না। অনুপস্থিত পট্‌লি সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা নানা সন্দেহ মনকে অত্যন্ত বিষাক্ত করে তোলে। দেবতাদের পর্য্যন্ত গালাগাল দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভয় করে। হয়ত হাত দুটো পর্য্যন্ত যাবে শেষে। মনের মধ্যে সমস্ত বিষ চেপে সে গুম্ হয়ে থাকে।

পট্‌লি কাজ থেকে ফিরলে আর কিন্তু সে চুপ করে থাকতে পারে না। সমস্ত দিনের নানান সন্দেহ তাকে কাঁটার মত খুঁচিয়ে অস্থির করে তোলে। তবু স্পষ্টভাবে

পট্‌লিকে কিছু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। তার স্থূল বুদ্ধিতে সে চেষ্টা করে কথা ঘুরিয়ে পট্‌লির কাছে সব জান্‌তে।

জিজ্ঞাসা করে, "পান বুঝি আজ কেউ খাওয়ালে—না পট্‌লি?" একটু হাসবার ভাণও করে সঙ্গে সঙ্গে।

পট্‌লি সবই বোঝে। এমন প্রশ্নে সে অভ্যস্ত। গা তার জ্বালা করে ওঠে।

সে রেগে উত্তর দেয়—"হ্যাঁ খাওয়ালে, আমার পেয়ারের লোক খাওয়ালে। হয়েছে ত!"

তাড়াতাড়ি বিষ্ণু শুধরে বলে, "আমি কি সে কথা বলছি। অমনি জিজ্ঞেস করতে নেই কি?"

"না নেই! ভূ-ভারতে আর জিজ্ঞেস্ করবার কথা নেই?

বিষ্ণু খানিক চুপ করে থাকে। কিন্তু চুপ করে থাকাও অসহ্য। মনের ভেতর অনেক প্রশ্ন জাগে। সেগুলোর উত্তর না হলে শান্তি হয় না। আবার আস্তে আস্তে সুরু করে,—

"কথা কইলে তুই ত রাগ করবি। তাই ত কথা কই না। আচ্ছা, তোদের সঙ্গে বেটা ছেলে কজন কাজ করে? আবার যেন তেড়ে উঠিস্ নি বাপু!"

হাত-পা ধুতে ধুতে পট্‌লি এবার একটু মুচ্‌কে হাসে, বলে, "পাঁচ পাঁচটি মদ্দ মিন্‌ষে, আমি একাই যা মেয়ে মানুষ!"

"যাঃ, তুই মিথ্যে কথা বল্‌ছিস্।"—বিষ্ণুর অত্যন্ত খারাপ লাগে।

পট্‌লি এসে কুপি জ্বালে। তারপর হাঁড়ি থেকে পান্তা ভাত থালায় বাড়তে বাড়তে বলে, "সত্যিই বলি আর মিথ্যেই বলি, বুঝবি কি করে বল্‌!"

খানিকক্ষণ আর কথাবার্ত্তা চলে না। ভাতের একটা থালা এগিয়ে দিয়ে পট্‌লি বলে, "খাও এসে—"

পাঁচটি অপরিচিত পুরুষের চিন্তায় হাবার সমস্ত ক্ষিদে উবে যায়। কিন্তু সে কথা সোজাসুজি আর পাড়তে পারে না। অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করে—

"তোর অত আচার বিচের কোথায় গেল পট্‌লি? ধোপানি মাসির সঙ্গে থাকতে বেশত কদিন ধম্ম কম্মে মতি গিছল। বাসি এ্যাড়া কাপড়ে এমন করে ত খেতে বসতিস্ না।"

মুখে ভাতের গ্রাস তুলে পট্‌লি একগাল খায়। তারপর ঘটিটা বাঁহাতে শূন্যে তুলে আলগোছে খানিকটা জল খেয়ে ঘটি নামিয়ে রেখে অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে বলে,—"কি হবে ধম্ম-কম্ম করে! ঠাকুর-দেবতার পুজোই বা করব কেন শুনি? কপালে এমন সোয়ামী লিখেছে বলে?"

"সোয়ামী কি আর কপালে লেখা হয়? এ যে জম্ম জম্মের সম্বন্ধ। স্বয়ং বিধেতাপুরুষও বদলাতে পারে নারে পট্‌লি! আর এজম্মেই না হয় খোঁড়া হয়েছি, আর জম্মে যখন সুপুরুষ হব!"—গভীর বিশ্বাসেই বিষ্ণু কথাগুলো বলে।

কিন্তু পট্‌লি হেসে ওঠে। বলে, "আর জম্মে তুই রূপী-বাঁদর হবি—আর আমি তোর কোমরে ছেকল বেঁধে নাচাব।" বলে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

বিষ্ণু অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে রেগে ওঠে, গম্ভীর হয়ে বলে,—"মুখে পোকা পড়বে পট্‌লি! গুরুজনকে নিয়ে ঠাট্টা অমনি সোজা কথা নয়!"—তারপর আর থাকতে না পেরে সোজাসুজি আসল বক্তব্যে নেমে বলে—"সব বিচের হবে! আড়ালে কর্ সামনে কর্—যা কিছু কর্‌ছিস্ সব একজন দেখচে। তুই পাঁচটা মদ্দর সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছিস্ কিনা আমি না হয় দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওপরে যে আছে তার চোখে ত আর ধূলো দিতে পারবি না? আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না বলে আমি কি আর বুঝি না কিছু ভেবেছিস্—আমি কি গাড়োল? পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে তুই একা মেয়েমানুষ কি করে কাজ করিস্ শুনি! আর কি কাজ নেই ওখানে ছাড়া?—"

পট্‌লি খেতে খেতে শুধু হাসে, কথা বলে না।

অধিকাংশ সময়ে অমনি হেসেই পট্‌লি সব উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু কদিন থেকে পট্‌লির ধনুক-ভাঙা পণ—সে কাজে যাবে না।

"তোর যদি এত আমায় অবিশ্বেস ত আমায় চোখে চোখে রাখ্, না হয় ঘরে তালা দিয়ে রেখে রোজগার করে আন্—; আমি বেরুব না।"—পট্‌লি বলে।

বলবার কিছু পায় না বলেই বোধ হয় বিষ্ণু চুপ করে থাকে। দুটো লাঠি দু বগলে দিয়ে কোন রকমে সে পা দুটোকে ঘসড়ে খানিক দূর যেতে পারে। তেমনি করেই সে ভিক্ষে করে ধার করে যা করে হোক কয়েকদিন মুড়ি কড়াই যোগাড় করে এনেছে। এবং পটলি তা খেতে আপত্তি করেনি। চুরিচামারী যা করে হোক বিষ্ণু তাকে এনে খাওয়াক, তার আপত্তি নেই—সে নিজে কাজে বেরুবে না।

এমনি করে কদিন কাট্‌ল।

চার দিনের দিন দুপুর বেলা হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখতে দেখতে স্তম্ভিত বিষ্ণুকে দরজার কাছে এক রকম লাফ কেটে ডিঙিয়ে পট্‌লি বাইরে বেরিয়ে গেল।

পোড়ো খানিকটা জমির একধারে সারবন্দী পট্‌লিদের বস্তি—খোলা ও টিনের চালের মেটে ঘর। বস্তির সামনে দিয়ে একটুখানি অতি সঙ্কীর্ণ চলবার পথ লম্বা অত্যন্ত পঙ্কিল দুর্গন্ধময় একটা কাঁচা নর্দ্দমার সঙ্গে অস্বস্তিকর মিতালি পাতিয়ে গলাগলি করে বস্তি ছাড়িয়েও কিছু দূর গিয়ে অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান হয়েছে। পোড়ো জমিটি আশপাশের পাকা বাড়ীগুলির রাবিশে, বস্তির ঘুঁটেতে ও তার নিজস্ব রুগ্ন কয়েক গোছা ঘাসে সমাচ্ছন্ন।

পট্‌লিদের ঘরের ছোট্ট কাঠের জানলা থেকে এই মাঠটি দেখা যায়।

সাধারণতঃ মাঠটি নির্জ্জনই থাকে। দু একটা পথ-শ্রান্ত বেওয়ারিশ কুকুর কখন কখন রৌদ্রে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রা দেয় মাত্র। কিন্তু এখন মাঠটিতে লোক ধরে না। লোকের ভিড়ের মাঝে চক্রাকার খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে এবং তারই এক পাশে গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি-ধারী এক সাপুড়ে তার অপরূপ আকারের বাঁশিটি গলা ফুলিয়ে বাজাতে বাজাতে বিচিত্র ভঙ্গিতে বাঁচার বাঘের মত সামনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিক্রমণ করছে। চক্রাকার স্থানের মাঝে সাপুড়ের ঝোলা-ঝুলি ও ঝুড়ি-চুবড়ি রক্ষিত এবং তারই এধারে একটি কাণা শীর্ণ চেহারার সাধারণ লোক খানিকটা ধূলো হাতে নিয়ে সাপুড়ের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রেখে বিড়বিড় করে বোধ হয় কোন মন্ত্রই পড়ছে।

লোকের ভিড় হওয়া আশ্চর্য্য নয়—কারণ ব্যাপারটা গুরুতর—বাণ মারামারি চলছে।

বাণটা অবশ্য অদৃশ্য এবং বিদ্যাটা বোধ হয় মহা-ভারতের যুগ থেকে কোন রকমে এত দূর পর্য্যন্ত চুঁইয়ে এসেছে। কারণ খানিক বাদেই কাণা লোকটি মন্ত্রপূত ধূলি সাপুড়ের দিকে ফু দিয়ে নিক্ষেপ করা মাত্র কাণভারী ঘুড়ির মত পাক খেতে খেতে সাপুড়েটি ভূমিশায়ী হল এবং দেখা গেল বাঁশিটি তার গলার মধ্যে একেবারে আটকে গেছে। তারপর বিস্তর গোঙানি ছট্‌ফটানি ও অবশেষে মুখ দিয়ে কিঞ্চিৎ রক্তপাত হবার পর বাণবিদ্ধ সাপুড়ে আরো কিঞ্চিৎ ধূলিকে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে সে বাণ কাটাতে সক্ষম হল বোঝা গেল।

বাণটা যে জবর মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাণা লোকটির দিকে চেয়ে সবাই তা স্বীকার করলে। পরস্পর বহু অপমান-সূচক বাণী-বিনিময় ও দর্শকদের কাছ থেকে কিছু অর্থাগম হবার পর আবার কাণা ও সাপুড়ের পরিক্রমণ সুরু হ'ল।

পট্‌লির হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথম বিস্ময়টা কাটলেই বিষ্ণু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এবং বাইরে বেরিয়ে লোকের ভিড়ের কারণ অনুসন্ধান করে পট্‌লির আকস্মিক বেরিয়ে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

নিজে সে এইবার এই উপাদেয় তামাসা দেখবার জন্যে একটুখানি সুবিধা মত স্থানের চেষ্টা করছিল। কিন্তু তামাসা দেখা তার আর হ'ল না। বাড়ীওয়ালা হরি ময়রা তার হাতটা ধরে ভিড়ের বাইরে মাঠের

একবারে কোণে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লে, "ও ছোঁড়াটা কেরা বিষ্টু?"

"কই?"—তখনও বিষ্ণু দেখেনি।

"ওই যে তোর বৌ যার একেবারে গায়ে ঢলে পড়ে কথা কইছে! ওই যে লম্বা গোরাপানা ছোঁড়া!"

বিষ্ণুর চিন্‌তে এতক্ষণে আর বাকী নেই। তার বুকের ভেতর কে যেন ছুঁচ চালাচ্ছিল।—এই জন্যেই পটলি চার দিনের পর ঘর থেকে অমন ছুটে বেরিয়েছিল! অথচ চার দিন সে ধনুকভাঙা পণ করে ঘর থেকে বেরোয়নি!

বিকৃত তীক্ষ্ণ গলায় সে চীৎকার করে ডাকলে, "পটলি!"

তারা তখনও কথায় একেবারে তন্ময়—পট্‌লি লোকটার বড় বেশী কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল বটে!

অত্যন্ত হিংস্র একটা মুখভঙ্গি করে অক্ষম ক্রোধে একটা বড় ঢিল কুড়িয়ে বিষ্ণু তাদের দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারল। সৌভাগ্যক্রমে ঢিলটা তাদের বা কারুর গায়েই লাগল না। পট্‌লি তখনও লোকটার অত্যন্ত নিকটে ঘেঁসে হাসতে হাসতে কি বলছে! বিয়ে হওয়া ইস্তক এত সোহাগ করে কথা সে বিষ্ণুর সঙ্গে কখনও কয়নি।

অবাক হয়ে হরি ময়রা তার হাতটা চেপে ধরে ফেল্লে—"আরে হাবা করে কি!"

নিজের অক্ষমতায় ক্ষোভে দুঃখে রাগে ঈর্ষায় বিষ্ণুর চোখ দিয়ে তখন উষ্ণ অশ্রুর ধার গড়িয়ে পড়ছে।

—ক্রমশ

উত্তর বায়ু

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

খোল' দ্বার, খোল' দ্বার—খুলে দাও দ্বার;
ম্লান হ'ল শরতের শ্যাম উপচার;
বায়সের তিক্তকণ্ঠ, কুয়াশার সুধীর সঞ্চার—
হেরি মাঝে তা'র
শেষ গান, রিক্ত প্রাণ, ছিন্ন কণ্ঠহার।
ঝরা পাতা, ম্লান ফুল-ফল,
শুষ্ক ধূলি জমিছে কেবল;
জীর্ণ তনু; কাঁপে বুঝি স্নায়ু।
খোলো দ্বার, খোলো দ্বার; আসিয়াছে
উত্তরের বায়ু।

কাঁপে শিরা-উপশিরা ; কাঁপে আজি
নিখিলের প্রাণ ;
কোমলতা হয় অবসান।
শুষ্ক দেহ, শুষ্ক মুখখানি।
নাহি সরে বাণী।
কোথা' শোভা-শ্যামলতা ? স্নেহপ্রেম নাশি'
হাসি' অট্টহাসি
শেষ করি' নিখিলের আয়ু
এল তীব্র উত্তরের বায়ু !

তুমি এলে হে নিঠুর, কা'র ব্যথা বহি' ?—
কা'র লোহু পিয়া রহি' রহি' ?
কা'র অশ্রুজলমাখা চক্ষু দু'টি অন্ধ করি' দিয়া,
কাঁপাইয়া ধরণীর হিয়া,
হিমানীর বুকে সঞ্চরিয়া,
তীব্রতারে লভি',
হতাশায় ভরি' প্রাণ, ম্লান করি' আকাশের রবি,
বহি' কা'র আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস,
এলে তুমি উত্তর-বাতাস ?

তোমারে চাহেনা ধরা হে বিজয়ী,
হে নিঠুর-রাজ !
তবু হেরি নাহি তব লাজ !
বিরাগের রসহীন শুষ্ক আভরণে
কেন তা'রে সাজাও যতনে ?
তীব্র তুমি, দৃপ্ত তুমি ; তোমার পরশ
নিল তা'র সকল হরষ।
নিল' তা'র আশা, নিল গান ;—
জরা-ভরা বৃদ্ধা ধরা—দীপ্তি অবসান।

তুমি মহাকাল-সখা ; শুভ্র তব উত্তরীয় খানি
শীতের রথাগ্রে চলে। টুটে যায় গ্লানি ;
টুটে মোহ, টুটে চিন্তা-ভার ;
খুলে যায় দ্বার—
মুছে যায় মিথ্যা আশা ; রাশি রাশি
কল্পনার ভার !
বহ' বহ' উত্তর-বাতাস,
আনো আজি বিরহীর আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস !
সুতীব্র চেতনা দাও ; জড়ে দাও শীতের কাঁপন ;
খুলে দাও ঘুমের বাঁধন।

আর্ট কি ?

Benedetto Croce হইতে—

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

আর্ট হচ্ছে অন্তরের সত্য দৃষ্টি (vision) আত্মার সহজ অনুভূতির (intuition) প্রকাশ। আর্টিষ্ট একটি রূপ (image) বা কল্পলোকের স্বজন করেন। রসিক ব্যক্তি এই কল্পলোকের মুক্ত দ্বার দিয়ে রূপকে দেখেন ও সেই রূপ আপনার অন্তরে আবার স্বজন করে নেন। আর্টের কথার আলোচনায় 'অনুভূতি' 'মরমী দৃষ্টি' 'কল্পনা' 'চিন্তা' 'অরূপের রূপমূর্ত্তি' ইত্যাদি নানা কথা আসে।

আর্টকে যদি মরমী দৃষ্টি বা আত্মার সহজ অনুভূতি বলা যায়, তাহলে আর্ট কি নয়, তা ভাল করে বুঝতে হবে।

আর্ট কোন একটা বস্তুমূলক বা বাস্তব ঘটনা (physical fact) নয়। কতকগুলি বিশেষ বর্ণের সমষ্টি বা তাদের সম্বন্ধ, দেহের কয়েকটি রূপ বা বিশেষ মূর্ত্তি বা ভঙ্গি, কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি বা তাদের সম্বন্ধ, উত্তাপ বা বিদ্যুৎ এরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা, মোট কথায় যাকে physical বলা যেতে পারে, তা আর্ট নয়। সাধারণতঃ লোকে আর্টকে বস্তুমূলক বা বস্তু থেকে উদ্ভূত বলে ভুল করে। ছোট ছেলেরা যেমন সাবানের ফেণার রঙীন গোলা স্পর্শ করে আকাশের রামধনু স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়ায়, তেমনি মানুষের মন সুন্দর জিনিষ দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের কারণ

সন্ধান করে এবং সিদ্ধান্ত করে যে এই রং সুন্দর, এই রং কুৎসিৎ, এই মূর্ত্তি বা রূপ সুন্দর, এই মূর্ত্তি কুৎসিৎ। যদি প্রশ্ন করা হয় যে আর্ট physical fact নয় কেন, তবে তার উত্তরে এই বলতে হবে যে physical fact does not possess reality—physical fact সত্য নয়। আর আর্ট হচ্ছে পরম সত্য। এই আর্টের সাধনায় কত জন আজীবন দান করেছে, কত লোক স্বর্গীয় অসীম আনন্দ পেয়েছে! আর্ট হচ্ছে supremely real. সুতরাং আর্ট physical fact হতে পারে না, কারণ physical fact হচ্ছে unreal. (ভারতীয় দর্শনে যাকে মায়া বলা যায়)। কথাটা প্রথম অদ্ভুত শোনায় বটে। মনে হয়, এই যে বস্তুপুঞ্জময় পৃথিবী এর মত সত্য এর মত নিশ্চিত আর কি আছে? কিন্তু দার্শনিক মতে ভাবলে বোঝা যায়, তা নয়। শুধু Materialists বা physicistsদের কথা বলছি না, এখন সকল মনস্তত্ত্ববিদ্ দার্শনিকের মতে সকল প্রাকৃতিক বা বস্তুসংঘটিত ঘটনা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি—physical facts reveal themselves as a construction of our intellect for the purposes of science.

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আর্টকেও কি physically তৈরী করা যায় না? হাঁ, তা যায়। যেমন ধরুন, যদি কোন কবিতার ভাব বা অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে চেষ্টা না করে সে কবিতাতে কতগুলি কথা আছে, তা গুণতে আরম্ভ করি, অথবা কোন পাথরের মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য উপভোগ না করে তাকে ওজন করি, কত লম্বা কত চওড়া তা মাপি—

সে মূর্ত্তিটিকে প্যাক করে পাঠাতে হলে অবশ্য তা বিশেষ দরকার হয়।

আর্ট তাহলে দেখা যাচ্ছে physical fact নয়, অর্থাৎ আমরা যদি কোন জিনিষের রস গ্রহণ করতে চাই, তার অন্তর্নিহিত সত্য জানতে চাই, তাহলে তা physically construct করে হবে না।

আর্টকে যদি intuition বলা যায়, তাহলে আর্ট কোন প্রয়োজনীয় বস্তু বা কার্য্য নয়; আর্ট প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অতীত। আর্ট utilitarian act নয়। কোন utilitarian actএর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখভোগ করা এবং বেদনাকে দূরে রাখা। আর্ট যদি utilitarian act না হয়, তা হলে তার সঙ্গে প্রয়োজনের বা সুখভোগ বা দুঃখভোগের কোন সম্বন্ধ নেই।

একথা সবাই মানবেন যে, যে কোন সুখ, বা যে কোন বস্তু সুখ দিলেই তা artistic নয়। তৃষ্ণার সময় শীতল জল পান করে সুখ হয়, উন্মুক্ত মাঠে বেড়ালে দেহের সুখ হয়, রক্তচলাচল ভাল হয়,—সেজন্য শীতল জল বা উন্মুক্ত স্থান artistic নয়।

অনেক-সময় দেখা যায় যে কোন ছবি বা মূর্ত্তি আমাদের বিশেষ সুখ দেয়, কারণ সে ছবি আমাদের কোন প্রিয়জনের ছবি, তার সঙ্গে অনেক মধুর স্মৃতি জড়ানো, অথচ সত্য ভাবে দেখলে সে ছবিটা কুৎসিৎ। আবার অনেক সুন্দর ছবি কুৎসিৎ লাগে, আমাদের মনে ঘৃণা বা ঈর্ষা জাগায়। তার কারণ, আমরা যাকে ঘৃণা করি বা ঈর্ষা করি এমন কোন শিল্পী দ্বারা সে ছবি অঙ্কিত।

অনেকে এখন বলতে পারেন যে সকল রকম সুখের অনুভূতিই যে আর্ট তা নয়, তবে কোন বিশেষ প্রকারের সুখের অনুভব হচ্ছে আর্ট—art is a particular form of the pleasurable। এই মতাবলম্বী লোক অনেক আছেন।

যেমন প্রত্যেক ভুলের মধ্যে একটু সত্য নিহিত আছে, তেমনি এই ভুলমতের মধ্যে এই সত্য আছে যে, আত্মার সকল প্রেরণা বা কর্ম্মের মধ্যে যেমন আনন্দ জড়িত আছে তেমনি আর্টের সঙ্গেও আনন্দ জড়িত আছে, কারণ আর্ট হচ্ছে আত্মার একটি শক্তির প্রকাশ—intuition.

তৃতীয়তঃ আর্ট কোন নৈতিক কর্ম্ম নয়—moral act নয়। কারণ, intuition হচ্ছে theoretic act, তা ইচ্ছা বিনা সৃষ্টি, তার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির বা প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধ নেই। আর্ট সম্বন্ধে অতীতকাল হতে সবাই বলে এসেছেন যে আর্ট ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না-

does not arise as the act of the will. সুতরাং সৎ ইচ্ছা দ্বারা সৎলোকের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু আর্টিষ্ট তৈরী করা যায় না। আর্ট যদি কোন ইচ্ছাশক্তির ফল না হয়, ইচ্ছা দ্বারা যদি সৃষ্টি করা না যায়, আর্ট যদি ইচ্ছালোকের অতীত বস্তু হয়, তাহ'লে আর্টের ওপর কোন নীতির শাসন চলে না, নীতির নিয়ম দ্বারা তার বিচার বা আলোচনা করা যায় না। নীতির বিচারের রাজ্যে আর্ট কোন বিশেষ কারণ দেখিয়ে বা বিশেষ দাবী বা অধিকারের দোহাই দিয়ে বল্‌ছে না যে আমায় নীতির নিয়ম দিয়ে বিচার করো না। বস্তুতঃ আর্ট ভালমন্দ বিচারের নীতির রাজ্যের এলাকার বাহিরে। কোন ছবি বা মূর্ত্তি, কোন সুনীতিকর বা দুর্নীতিকর ঘটনার বা বস্তুর প্রতিরূপ হতে পারে; কিন্তু সেই প্রতিরূপ (image) নিছক artistic image হিসাবে নীতির নিয়ম দ্বারা ভাল বা মন্দ বিচারের বাহিরে। সেই artistic রূপকে নীতির নিক্তিতে বিচার করবার কোন পেনাল কোড্ নেই, তাকে কুনীতিপূর্ণ বলে দণ্ডনীয় করে কারাগারে বন্দী বা ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। নীতির নিয়মে, এই ত্রিভূজটা ভাল, এই ত্রিভূজটা মন্দ, একথা আমরা যেমন বল্‌তে পারি না, তেমনি Danteর Francesca কুনীতিপূর্ণ, Shakespeareএর Cordelia সুনীতিপূর্ণ, একথাও আমরা বলতে পারি না। কারণ these have a purely artistic function. এরা হচ্ছে নিছক আর্টলোকের সৃষ্টি, দান্তে এবং সেক্স্‌পিয়ারের আত্মার সঙ্গীতের স্বরলিপির মত।

আর্ট নীতির নিয়ম পালন করে চলবে, এই মত যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁরা বলেন, যে আর্টের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হচ্ছে—সৎএর জয়ঘোষণা করা, মন্দের প্রতি ঘৃণা বা ভয় জাগান, কুসংস্কার কদাচার সংশোধন করা বা দূর করা ইত্যাদি। তাই আজকাল নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে, দেশভক্তি বা জাতিগৌরব জাগাতে, আর্টিষ্টদের আহ্বান করা হয়। বস্তুতঃ সমাজে সৎনীতি প্রচার কার্য্য যেমন জ্যামিতি দ্বারা হ'তে পারে না, তেম্‌নি আর্টের দ্বারাও হতে পারে না। এসব সৎকাজ জ্যামিতি করতে পারে না বলে জ্যামিতির মূল্য বা প্রয়োজন কিছু কমে না। আর্টের মূল্যই বা কেন কমবে ?

আর্ট হচ্ছে intuition. এই অনুভূতি সুতার মত বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে এক করেছে—unity দিয়েছে। আর্ট অনুভূতির রূপ, অনুভূতি হতে তার জন্ম, তার মূর্ত্তির বিকাশ। কোন আইডিয়া বা চিন্তা নয়, কিন্তু এই অনুভূতি আর্টকে রূপকের মত করেছে। রূপের রেখায় বেদনা বন্দিনী বা মূর্ত্তিমতী—এই হচ্ছে আর্ট—an aspiration enclosed in the circle of a representation. এখানে রূপ হচ্ছে বেদনার একমাত্র রূপক বা প্রতীক। বেদনা ও রূপে ভেদাভেদ নেই। অনেকে আর্টকে ভাগ করেছেন—epic, lyrical, drama. কিন্তু আর্টকে ভাগ করা যায় না—কারণ তা সব সময় আত্মার অনুভূতির বা বেদনার প্রতীক—art is always lyrical—that is, epic and dramatic in feeling.

আর্ট-রসিক সুপ্রসিদ্ধ ইতালিয়ান বেনেদেৎতো ক্রোচের লেখাসম্বন্ধে পাঠকপাঠিকাদের ঔৎসুক্য জাগাবার জন্যে তাঁর What is Art প্রবন্ধ হতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করে দিলুম।

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

নিঠুর গরজী

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

মাসীর প্রাণ আন্‌চান্‌ করে—

একটি কচি ছেলে নাই বাড়ীতে।

মাটিতে ভাল করিয়া পা পড়ে না। দেহখানি টল্‌মল্‌ করে। একবাড়ী লোক এম্‌নিধারা একটিকে সাম্‌লাইতে যাইয়া পাগল হইয়া ওঠে—

সময় জলের মত যায়।

কিন্তু একি!—

একবাড়ী লোক কথা কয়, কাজ করে, হাসে, কিন্তু সবই যেন চাপা চাপা ভার ভার ঘোলা ঘোলা—হাল্কা প্রাণের সে স্ফূর্ত্তি কই?..... মানুষের শুষ্কবুকের খোরাক!...

......একবিন্দু পারার মত শিশুতনু!

কেবলি সঙ্কটের দিকে ছোটে—

দশ বিশটা লোক হিম্‌সিম্‌ খাইয়া যায়, তবু তাহাকে বশে আনা যায় না!......

মাসীর কান খাড়া হইয়া চারিদিকে যেন চৌকি দিয়া বেড়ায়।—

রাস্তায় শব্দ হয়; অম্‌নি মাসী বেড়ার পাশে ছুটিয়া যায়; দেখে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কলকণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে.........তারা সব রকমেই বিচিত্র।—

মাসীর চোখ যাইয়া পড়ে সকলের ছোটটার উপর। বড় দুরন্ত সে; মুহুর্মুহুঃ আগাইয়া পিছাইয়া সঙ্গীদের পায় পায় চলে—একবার এর পাশে, একবার ওর পাশে; দৌড়ায়—

এই বুঝি পড়ে!......

দলের বড় মেয়েটাকে ডাকিয়া মাসী বলে,—এই, ওকে ছেড়ে দিয়েছিস্‌ যে?

মেয়েটা মুখ ফিরাইয়া বলে,—ও আমার কেউ হয় না।

রাগে মাসীর মন গপ্‌গেপ্‌ করে, বলে,—আবাগী!

কিন্তু ততক্ষণে তারা আগাইয়া গেছে।

কোথায় দূরে কাদের ছেলে কাঁদে—

মাসীর কানে সেই শব্দ আসে, বুক রৌদ্ররসে ভরিয়া যায়; মনে মনে মারমুখী হইয়া বলে,—মাগীরা বিইছিলি কেন যদি সাম্‌লাতে না পার্‌বি?...

অচেনা কাহাদের আদুরে' ছেলে মেয়ে ঝি-চাকরের কোলে-কাঁখে চড়িয়া সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়—

মাসী ভাবে,—একটিবার আসে না আমাদের বাড়ী বেড়াতে! কোলে করি।......তারপর ঝি-চাকরদের উদ্দেশে বলে,—শত্তুররা সব!—

বোন্‌পোরা দিনে খায় দুটোয়, রাত্রে খায় একটায়; বাকি সময়টা তারা সর্ব্বদাই সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়া ছেনি-হাতুড়ীর খুটুখুটু শব্দ করে।......

কত লোক আসে যায়, মেয়ে পুরুষ!—

মেয়েরা যারা আসে তাদের মাসী দেখিয়াই চিনিয়া ফেলে......অমন ফিন্‌ফিনে কাপড়......ভদ্রলোকের বৌ-ঝি তারা নয়। মাসী ভ্রুভঙ্গী করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে, মনে একটা জ্বালা জন্মে......

আবাগীরা! পাপের সোনায় নিজের গা সাজাবে! সোনা মানায় ছেলের গায়ে,—চাঁদের গায়ে সোনা।......

বলে,—শুন্ছিস্, কেদার, মানুষে গয়না গড়তে দেয় কিসের রে?

মুখ তুলিয়া কেদার মাসীর দিকে তাকায়; বলে,—সোনার।

—তা' বল্ছিনে, বিয়ের না ভাতের?

—বিয়ের ভাতের দুই-ই।

—এক কাজ করিস্ তোরা, ছেলের গায়ের সোনা চুরি করিস্নে, বুঝ্লি? ওরা নারায়ণ।

কেদার ভাতের ডেলা গিলিয়া বলে,—ছেলেরা নারায়ণ, মেয়েরা লক্ষ্মী—তা হ'লে ত আমাদের কাজই চলে না, মাসি! বলিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

মাসী সেই হাসির দিকে চাহিয়া মনে মনে কটুকণ্ঠে বলে,—মরণ!......

একদিন শীতের দ্বিপ্রহরে একটি বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে আসিয়া মাসীর উঠানে দাঁড়াইল—

তার হাতে নূতন লাল শাঁখা, গায়ে ডোরা চাদর, কোলে কচি ছেলে, মাথায় কাপড়—

মাসী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই মেয়েটি কোলের ছেলেটিকে মাটিতে নামাইয়া মাসীর পায়ের ধূলা নিল।

মাসী বলিল,—বেঁচে থাক, জন্ম এয়োস্ত্রী হও। তুমি কে মা?

—আমি তোমার বোন্-ঝি, মাসি। বলিয়া মেয়েটি একটু হাসিল।—আমার মায়ের মতই তুমি দেখ্তে'।

—তোমার ছেলে?...জিজ্ঞাসা করিয়াই এবং সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাসী খাঁ করিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুমায় চুমায় ছাইয়া দিল।......

মাসীর বুকের ভিতর কচি ছেলের যে ছাঁচ্ ছিল, সেই ছাঁচে ঢালিয়াই কে যেন ছেলেটিকে গড়িয়াছে—

মাসীর আর কোনো জ্ঞান রহিল না।......

মেয়েটির নাম রূপসী—

কিন্তু রূপ তার নাই, 'অঙ্গসৌষ্ঠব' আছে।

..... আসিতে আসিতেই ভাবের প্লাবনে ভাসিয়া পরিচয়ের দশটা দিকেই তাকান হয় নাই; ক্রমশঃ সেটা খুলিয়া আসিতে লাগিল...

রূপসীর মা নাই, বাপ নিরুদ্দেশ—

স্বামী মত্তপ্; তার প্রহারের চিহ্ন খুঁজিলেই দেহে পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাহিরের ঐ চিহ্ন যন্ত্রণার কতটুকু প্রকাশ!......মন উদাসী হইয়া গেছে......মনের ব্যথা জানেন শুধু অন্তর্য্যামী!—

চোখে জল টল্টল্ করে; রূপসী বলে,—মাসি, আমি আর পারিনে। জাল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু কেমন ক'রে কোথায় গিয়ে নতুন করে সুরু ক'রব তা' জানিনে। পিছনে কে যেন বুকে হেঁটে' তেড়ে আস্ছে..... সর্ব্বদাই মনে হয় তার মুখের হিস্হিস্ শব্দ ঐ যেন শুন্ছি। তোমাদের গেরস্থালির পানে চাইতে আমার ভয় করে—পাছে অকল্যাণ আসে।...কিছুই ভাবতে পারিনে, বুকের ব্যথায় ভাবনা ঢাকা পড়ে গেঁছে। আমায় তাড়িও না, মাসি।

মাসী বলে,—তুই এখানেই থাক্, সুখে থাক্‌বি।

—সুখ চাইনে, মাসি; আমি আর কিছুই চাইনে, কেবল আমায় যেতে বল না।

—না।.....

মাসী রূপসীর মাথার উপর হাত রাখে।—

রূপসীর ছেলেটিকে পাইয়া মাসী নিজেকে ভুলিয়াছে।—

ছেলেকে রোকা যায় না, এই বড় বাহার।...কি চাহিয়া সে কাঁদে, কি না পাইয়া সে রাগে, কি দেখিয়া কি শুনিয়া সে হাসে—তার কিছুই হদিস্ মেলে না...তাই মাসীর সুখ ধরে না।...

বলে,—ক্ষ্যাপা ছেলে, খেয়ালী।

ছেলে নিজের সুখ সুবিধা আরাম বোঝে না—মাসী তাইতেই গদগদ।...এমনি করিয়াই ভগবান মানুষকে অসহায় করিয়া মানুষের হাতে তুলিয়া দেন। আহা!... এইত জীবের—

তারপরই তত্ত্বকথা আসিয়া পড়ে।

রূপসী ছেলের দিকে একটা চোখ বন্ধ করিয়া আর একটা খোলা রাখে।...ছেলে কি খায় না খায়, কি পরে না পরে সে দিকে রূপসীর এম্‌নি নিস্পৃহ আচরণ যেন তাকে সে দশমাস দশদিন পেটে ধরে নাই; কিন্তু কোথায় সে যায় না যায় সে দিকে তার এমন তীক্ষ্ণ ব্যগ্র লক্ষ্য যে মাসীর মনকষ্ট আর অভিযোগের অন্ত থাকে না।... বলে,—পর কি কভু আপন হয়?—

যে ঘরে রূপসী থাকে সেই ঘরটি ছাড়া ছেলেকে অন্যত্র লইতে মাসীও পারে না; উঠান পর্য্যন্ত—তারপর আর সবই নিষিদ্ধ স্থান।

রূপসী বলে,—বড় দুষ্টু ছেলে মাসি, বড় ভাঙ্গার হাত।

মাসী ভাবে,—পরের বাড়ীতে মেয়ের লজ্জা করে; তা' দিনকতক কর্‌বে বৈ কি!...

তবু মাসীর আশ মিটিয়াছে। ছেলেকে মাসীই মানুষ করে।—

রূপসী কথা কয় খুব কম; কি যেন ভাবে—

হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া আতঙ্কে তাহার দু' চোখের দৃষ্টি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বল হইয়া থাকে...

মাঝে মাঝে মনে হয়, দেহ ছাড়িয়া তাহার মন বহুদূরে চলিয়া গেছে...চোখ বুজিয়া সে একান্তে বসে, মুখের ভাবে অর্দ্ধেক ভয় অর্দ্ধেক আনন্দ—যেন সকল ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া সে কি শুনিতেছে......সে চোখ খুলিলেই ভয় পাইয়া ধ্বনির সে সুখবিহার বন্ধ হইয়া যাইবে!...

সময় সময় মাসীর মনে হয় এ বড় দুর্লক্ষণ—

কিন্তু বেশী সময়ই মাসী নিঃশব্দ রোষে ফুলিতে থাকে সেই মাতাল জামাতার উদ্দেশে।........

কতদিনে মেয়ের ভয় কাটিবে কে জানে!—

কেদারের ভাই বিশ্বনাথ দৌড়াইয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—বৌদি, কে যেন এসেছে।

খবর ত এই—কিন্তু রূপসী রাঙা হইয়া উঠিয়া পর-ক্ষণেই মুখ চোখ চুপ্‌সিয়া ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

কে আসিয়াছে তাহা কেহ কাহাকেও জানাইল না, কিন্তু আগন্তুক যে রূপসীরই সেই পত্নীদ্বেষী মদ্যপ্ স্বামী তাহাতে অন্তঃপুরের কাহারো আর সংশয় রহিল না।

মাসী বলিল,—ভয় কি, মা;—এখানে এসে সাহস পাবে না।

কিন্তু মাসীর অভয়ে রূপসীর পাংশু মুখে রক্ত ফিরিল না।

মাসী বুঝাইল,—সোয়ামী কি ফেলে পালাবার জিনিষ পাগ্‌লি! অজ্ঞানে মার ধোর করে, কিন্তু দু'দিন দেখেনি অম্‌নি দেখ্ হাঁস্ ফাঁস্ করে' ছুটে' এসেছে।......

স্বামীর এই অতুল স্নেহের নিদর্শনেও রূপসীর হাত পা উঠিল না; সে খুঁটি ঠেস্ দিয়া তেম্‌নি নিঃশব্দে নির্জ্জীবের মত বসিয়া রহিল।—

মাসীরা দেখিল, জামাই অতিশয় কান্তিমান্ পুরুষ; দেখিয়া মনে হইল না, এই ব্যক্তি কোনো কালে মদ্যপান করিয়াছে।...মুখে মিষ্ট একটু হাসি...দোষের মধ্যে চাহনি একটু চপল। মাসী ভাবিল,—সবাই কি সমান

হয়!...বৌদের বুঝাইল,—বৌ হারিয়ে তুই চক্ষু দিয়ে কেবল তাকেই খুঁজছে।—

বৌরা স্ত্রৈণ ঠাকুর-জামায়ের উদ্দেশে মুখ টিপিয়া হাসিল।

কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা এই যে ছেলের বাপ্ ছেলেকে ত চাহিয়া পাঠাইল না!—

.....শয়ন কক্ষে পাঠাইবার সময় রূপসীর মুখের দিকে চাহিয়া মাসী ভয় পাইয়া গেল।......মুখে রক্তের লেশও নাই, ঠোঁটের উপর ঠোঁট সুকঠিন রেখায় আঁটিয়া বসিয়াছে ......যেন সে অপরিসীম তন্দ্রালুতার ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া হাতড়াইয়া চলিয়াছে—এম্‌নি আড়ষ্ট!

মাসীর পুরাতন সেই বধূ-হৃদয় মমতায় দ্রব হইয়া গেল; রূপসীর পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—আশীর্ব্বাদ করি মা, তোর সুখের সাগর উথলে উঠুক্।

রূপসী আচম্বিতে হেঁট হইয়া মাসীর পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল,—আশীর্ব্বাদ কর, মাসি, এ রাত যেন আমার না পোহায়।

আঁচল দিয়া রূপসীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া মাসী ভাবিল,—আশা-ভঙ্গের ব্যথা এম্‌নিই বটে......

সে রাত্রে মাসীর চোখে ঘুম আসিল না।—

মাতালের কাণ্ড যে......

কখন বোতল বাহির করিয়া দুই ঢোক্ গিলিয়াই সে পশুর নির্ম্মম নখ-দন্তে হিংস্র হইয়া উঠিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই।...কিন্তু গভীর রাত্রি একেবারে নিঃশব্দ।

হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দে তরল তন্দ্রা ছুটিয়া মাসী শয্যার উপর খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

অন্ধকার অদূরের কান্নার ছেদ বিরাম মাসী নিজের অন্তরের কান্না দিয়া পূরণ করিয়া লইতে লাগিল; তাহার মনে হইল নিরবচ্ছিন্ন ঐ ক্রন্দনের বিকৃত মৃদুধ্বনি যেন শীতের রাত্রির তুহিনের সঙ্গে মিশিয়া সৃষ্টিকেই ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে।

মাসী বাহিরে আসিল; নিঃশব্দে উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল; কান পাতিয়াও কান্নার শব্দ ছাড়া স্পষ্ট কিছু শোনা গেল না; ছাঁইচের ধারে আসিয়া শুনিল, রূপসী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমার অদৃষ্টে যা আছে তা' হোক্; তোমার সঙ্গে আমি যাব না...

মাসী ফিরিয়া আসিতেছিল—

কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—রূপসী!

কান্না থামিয়া গেল।—

সকালে উঠিয়া দেখা গেল, বংশী বিছানায় ঘুমাইতেছে; জামাই আর রূপসী কোথাও নাই!

অপার বিস্ময়ে বহুক্ষণ কাহারো মুখে কথা সরিল না। ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া বাপ-মা গেল কোথায়!

বংশীর ভার মাসী লইল।—

পরদিনই বৃদ্ধ একটি লোক হঠাৎ কেদারের দোকানে ঢুকিয়া হট্টগোল বাধাইয়া দিল,—রূপসী বলে' একটা মেয়ে এসেছিল না এখানে? এইটি কেদার কর্ম্মকারের বাড়ী ত? রূপসী আমার বেটার ঝি—কোথায় সে? বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

কেদার বলিল,—হ্যাঁ, এসেছিল, ক'দিন ছিলও; কিন্তু কাউকে কিছু না বলে' ছেলেটাকে ফেলে' রেখে' কাল রাত্রে সে তার সোয়ামীর সঙ্গে—

বৃদ্ধ বলিল,—সোয়ামী? সোয়ামী তার কে? সে ত বিধবা...

সর্ব্বনাশা

হাফেজ

নিদ্রার আমার অবকাশ নাই বন্ধু! সুন্দর তোমার ওই মুখখানি না দেখে বেঁচে থাকায় লাভ কি?

যেদিকে তাকাই—দেখি, তোমার বিরহে বিপন্ন সবাই। তোমার প্রেম যে সব-কিছু নষ্ট করেছে বন্ধু,—বুকে বুকে সেই একই আগুন জ্বালা।

তোমারই প্রেমের জ্বালায় তোমারই দুয়ারে যে হত্যা দিয়ে গেল,—তোমার বিচারালয়ে তার সম্বন্ধে আর কোনও কথাই ত' উঠ্‌লো না!

তুমি ত' দেখেছ বন্ধু,—আমার সখার মনের ভাব তুমি ত' লক্ষ্য করেছ! শুধু অত্যাচার আর উৎপীড়ন!—আর কিছু দেখেছ কি? আমার সঙ্গে সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, অথচ সখার আমার এতটুকু মনোবেদনা লক্ষ্য করেছ কি সেজন্যে?

তাঁর নিকেতনে পৌঁছোবার পথের সন্ধান যার মিল্‌লো না, মরু প্রান্তর ডিঙিয়ে আসা তার বৃথাই হলো বন্ধু,—কাবানিকেতনের পথ সে হতভাগার কাছে তিমিরাচ্ছন্নই রয়ে গেল।

প্রেমমত্ত প্রেমিকই ত' সুখী! ইহপরলোক বিসর্জ্জন দিতে যে পেরেছে, তার আর লাভ-ক্ষতির চিন্তা কিসের বল?

সুরা আনো, সুরা আনো, পানপাত্রদাতা! শত্রুকে বল—আমাকে তুচ্ছ ভেবো না বন্ধু, এমন পানপাত্র সম্রাট্ জমের হাতেও ছিল না; জানো?

যাও—যাও সংসারী তুমি ফিরে যাও, আমার সুমুখ থেকে তুমি সরে' পড়! স্বর্গের প্রলোভন আমায় আর দেখিও না বন্ধু,—স্বর্গ তৈরী আমার জন্য হয়নি।

সত্যের পথে—আত্মবিনাশের পথে বীজ যে ছড়ালো না, অমরত্বের শস্য-ভাণ্ডার থেকে একটি যবের কণিকাও সে পাবে না।

সুরা আমার কাছে নিষিদ্ধ নয় সোফি,—বারণ করো না তুমি! আমার আদি প্রকৃতি ওই সুরারই রসে তৈরী হয়েছে আমি জানি।

পুণ্যাত্মা সোফি স্বর্গলাভ করেন কেন জানো? একটুখানি নির্ম্মল সুরার জন্যে বৈরাগীর গেরুয়াখানি আমার যেমন বন্ধক পড়েছে সুরালয়ে,—সোফিরও ঠিক তাই......!

প্রেমাস্পদের অঞ্চলটুকু যার হস্তচ্যুত হলো—সুরাঙ্গনা-সহবাস কি তার পক্ষে সম্ভব হয় কখনও?

ভগবানের দয়া যদি তোমার ওপর থাকে হাফেজ, তবে তুমি নির্লিপ্ত থাকো,—স্বর্গের সুখ আর নরকের যন্ত্রণা সব কিছু থেকেই নির্লিপ্ত থাকো তুমি।

চয়নিকা

গুরুর দশা

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

গুরুভোজনের বিষময় ফলের কথা শাস্ত্রকার বলিতে কোনই দ্বিধা করেন নাই। কারণ, ইহার ফল ভোগ করিতে হয় সকলকেই, কাহারও এখানে রেয়াত নাই। শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষার বেলা যাঁহারা এতই তৎপর, মানসিক স্বাস্থ্যের বেলায় তাঁহারাই কেন যে এমন বে-পরোয়া, তাহা ভাবিবার বিষয়। একজনের অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি দ্বারা আর একজনের স্বাস্থ্য যদি ভাল হইতে থাকে, তাহা হইলে যাহার উপকার হয় সে বোধ করি ও-বিষয়ে চুপ করিয়া থাকিতেই ভালবাসে। এমন কি চুপ না করিয়া ও-বিষয়ে বিপরীত ভাবে মুখর হইয়া উঠিতেও দেখা যায়। গুরুভোজন সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকাররাও তেমনি অদ্ভুত মুখরতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কারণ, একজনের মানসিক ব্যাধি এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির ফলে, আর একজনের গৃহ স্বাস্থ্যে, ধনে, সম্পদে অর্থাৎ লক্ষ্মী-শ্রীতে ভরিয়া উঠিতে থাকে।

'গুরুভোজনের দিকে যেমন রোগীর ঝোঁকটাই বেশি, তেমনি গুরুভজনের দিকেও আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা অস্বাভাবিক রকমের ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুরুর প্রতি বিষম লোভের মনস্তত্বটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

মানুষের মনে কোনো একটা সংস্কার গড়িয়া উঠে দুইটি কারণে। অন্তরের একটা সংস্কারের দিকে প্রবণতা থাকা চাই, আর সেই সংস্কারটিকে জাগাইয়া এবং জীয়াইয়া রাখিবার বাহিরের দিক হইতে একটা চেষ্টাও চাই।

আমাদের অন্তরে এই গুরু-প্রবণতা রহিয়াছে কি না, যদি থাকে তবে তাহার স্বরূপ কি?

জন্মকাল হইতে শিশুকে আমরা কেবলি বাধা দিয়া আসিতে থাকি। সে আছাড় খাইয়া, পড়িয়া পড়িয়া, হাঁটিতে বসিতে শিখিবে ইহা আমাদের সহ্য হয় না। অতিরিক্ত স্নেহ শিশুর অকল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতে থাকে। কেবলি কোলে কোলে মানুষ করিতে গিয়া তাহার মানব-জন্মটাকে অস্বাস্থ্যের অভিশাপে জর্জ্জরিত করিয়া তবে ছাড়ি; কিন্তু এই সহজ সত্য কথাটাকে স্বীকার আমরা করিনা একদিনও।

যা হোক্ করিয়া তবু শিশু কোল ছাড়িয়া ধরণীর উপরই আপনার বিশ্বাসকে স্থাপন করে, আর আত্মবিশ্বাসের অমৃত পান করিয়া তাহাব স্বতন্ত্র হইবার শক্তি আসে। বাধা ঠেলিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইতে থাকে এই দেহের ক্ষেত্রে।

তার পর ছোট বেলা হইতেই মনের ক্ষেত্রেও এই লালনের লালায়িত স্নেহ শিশুর সর্ব্বনাশ বড় কম করে না। শিশু আপনা-আপনি চৌকাঠ ডিঙাইয়া যাইতে চায়, সিঁড়ি বাহিয়া উর্দ্ধে প্রয়াণ করিতে তাহার কৌতূহলের আর অন্ত নাই। মোহময় স্নেহ আসিয়া শিশুর এই বিকাশের প্রয়াসকে নির্ম্মূল করিয়া দিতে চায়। জুজুর ভয় আসিয়া শিশুর হাতে পায়ে কাল্পনিক এবং সেই জন্যই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়।

আবার কৈশোর আসে নব-বিকাশের এক আশ্চর্য্য প্রেরণা লইয়া। এই মন-মরা শিশুর দলও আবার কৌতূহলের প্রেরণায় বাহিরে যাত্রা করিতে চায়। এক নূতন স্বাধীনতা তাহাদের অন্তরে জন্ম কামনা করে, কিন্তু আবার অভিভাবক প্রহরীর দল সেই বিকাশের পথ

আগুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নবীন ভাব, নবীন চিন্তা, নবীন উদ্যম সব ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রতিযুগের প্রবীণেরাই ভাবেন যে, জীবনের যাহা কিছু নবীন প্রকাশ তাহা শুধু তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, বালকদের দ্বারা তাহা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং প্রবীণের একমাত্র স্নেহময় চেষ্টা, নবীন না পথ হারাইয়া ফেলে! তাঁহাদের পথ ছাড়িলেই যে নবীন পথ হারাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সুতরাং প্রবীণ প্রবল ভাবে নবীনকে পুরানো পথে পুরানো মতে পা ফেলিয়া চলিতে শাসন করে; ইহাই হইল শাস্ত্র বাক্য।

এদিকে শিশুকালে যাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কেবলি খর্ব্বিত হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের গাঁঠে গাঁঠে নূতন পথের ভীতি নরক-ভীতির মত জড়াইয়া আছে, সে তো চোখ খুলিতেই ভয় পায়। সে চোখ না-খুলিয়া যে-কাহারো হাত ধরিয়া, যে-কোথাও চলিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। এমনি করিয়া আমাদের পরনির্ভরতার শিক্ষা সুন্দর ভাবে চলিতে থাকে।

কিন্তু যে-কাহারও উপর নির্ভর করিলে ঠিক নির্ভাবনায় দিন কাটানো যায় না তো। অন্তর বলিতে থাকে, এটা ঠিক নয়, ঠিক নয়। তাই এই যে-কোন ব্যক্তিটিকে একেবারে 'ভগবান্ স্বয়ং' করিবার অপরূপ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের লোকেরা বড়ই ধার্ম্মিক; ইহ-সংসারের জন্য চিন্তা তত নাই, পরলোক সম্বন্ধে যত রকমের দুর্ভাবনা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের পাপ যত বেশি, পরলোকের চিন্তাও আমাদের তেমনি। চতুর যে দুর্ব্বলকে এখানে ঠকাইবে তাহাতে আর অস্বাভাবিক কি আছে! গুরু-ভগবান্ বলিলেন—ভয় নাই গো বৎসেরা, চক্ষু মুদিয়া আমার পায় মাথা ছুঁয়াইয়া পড়িয়া থাক, তোমার সব বোঝা আমার, নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সেবা কর।

গুরু শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়া গেল, ভাষাতত্ত্ব মন্থন করিয়া প্রমাণ করিলেন সংস্কৃতের শাস্ত্রী এবং এম-এ-রা যে গুরু হইতেছেন ভগবান্। তাহার পর নির্ব্বোধেরা ইহাও বলিল, অমুক গুরু, সুতরাং অমুক যে ভগবান্ তাহাতে আর লেশমাত্র সংশয়ের স্থান রহিল না। আরো শাসন-বাণী প্রচারিত হইয়া গেল, 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' কোনো রকমের সংশয় করিয়াছ কি মরিয়াছ! যেটি বলি সেটি বাক্যব্যয় না করিয়া চল, মৃত্যু অন্তে তোমার অক্ষয় স্বর্গ উইল-করা হইয়া থাকিবে।

গুরু-ভগবান্ কি করিতে পারেন তাহার অক্ষয় প্রমাণ বৎসদের বিশ্বাসে, সেই জন্য গুরু কি করেন তাহার সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই শিষ্যদের বড় একটা নাই। কি করেন তাহা বুঝিতে পারার মত আত্মবিশ্বাসও নাই বলিয়াই তো কি করিতে পারেন সে সম্বন্ধে বিশ্বাস এত অগাধ হইয়া উঠিতে পারে। আর আত্মবিশ্বাস না হারাইতে পারিলে, অমন সরা-সরি স্বর্গলাভও কিছুতেই হইতে পারে না। আঙুর খাইতে হইলে তাহার জন্য বিস্তর প্রয়াসের প্রয়োজন হয়; কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারাইয়া যদি হিপ্‌নটিষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে তো একেবারে অনায়াসেই যত ইচ্ছা কল্পোদ্যানের আঙুর খাওয়া চলিতে পারে! সুতরাং আত্মবিশ্বাস হারানোর সুবিধা বুঝিয়া বৎসরা গুরুভক্ত হইয়া উঠিতে কালবিলম্ব করেন না। আঙুর খাওয়ার সখটা না হয় হিপ্‌নটিষ্টের দ্বারা সহজে মিটাইয়া লইতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বৎসগণ তো এ কথাটি বুঝিতে পারেন না যে, ও-ভাবে সত্যকার ক্ষুধা মিটাইবার কাজটি সমাধা করা গুরুতর ব্যাপার। তাই দুর্ব্বলেরা শেষ কালে না-মরিয়া পথ পায় না। তবে মরিবার বেলা উহারা মনে করে যে, স্বর্গের রথে চাপিয়া বসা হইল। এটা একটা সান্ত্বনা বটে।

জড়তা একটা বিশেষ ধর্ম্ম বটে, কিন্তু ধর্ম্মটাও এক রকমের বিশেষ জড়তা, তাহা গুরু-ভগবান্ আসিয়া সত্য

বলিয়া প্রমাণ করিলেন। আত্মাকে জান, আপনার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ কর, এই ছিল এই দেশেরই সাধনার মূল নীতি, কিন্তু আপনাকে জড় বলিয়া জান এই অপূর্ব্ব অনুশাসন প্রচার করিলেন গুরু-ভগবান্। জড় হইবার সাধনায় হিন্দুসমাজ সিদ্ধ হইল, কারণ এই সাধনার শক্তি নিজেকে অর্জ্জন করিতে হয় না, আত্মশক্তিকে বর্জ্জনের দ্বারা জড়ত্বেরসিদ্ধিলাভ হয়। গড়াইয়া যাইবার গতি অর্জ্জন করিতে হয় একমাত্র নিশ্চেষ্টতার দ্বারা।

ইংরাজ আমাদের মনে দাস-মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছে এই কথাটিই আমরা বলি। আমাদের ধর্ম্ম-রাজ গুরু-ভগবানের সম্বন্ধে যে ওই কথাটি আরো বেশি সত্য, সেই কথা কল্পনাও করি না। চতুর ধর্ম্মরাজই ওই কথাটি জোর গলায় বলিয়া চলিয়াছেন যে, বিজাতীয় শিক্ষায়ই দেশের এমন অধোগতি। চতুর জানে যে, ওই জাতির সভ্যতার সঙ্গে যোগ তাহার নিজের ভবিষ্যতের পক্ষে তত শুভ নহে।

ইউরোপ এই দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং বিচার-স্বাতন্ত্র্যের বাণী লইয়া আসিয়াছে। ইহাই তো চিরকাল মানুষের অন্তরতম বাণী। জড়তা হইতে প্রাণে, অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে, নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষে, পরতন্ত্রতা হইতে স্ব-তন্ত্রতায় অভিব্যক্তিই তো এই সৃষ্টির অন্তরতম ব্যাপার। লয়পন্থীরা ঠিক ইহার উল্টা পথে চলিয়াছে। তাই প্রতি মানুষের অন্তরে যে ভগবান্ বিশেষ সত্তায় সত্য হইয়া আছেন তাঁহাকে দলিত করিয়া গুরু-ভগবান্ মৃত্যুর দিকে মানুষকে লইয়া চলিয়াছেন। যে-সব মানুষের মেরুদণ্ড সোজা ছিল, যাহারা এক একটি দীপ-শিখার মত ঊর্দ্ধে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিল, তাহারা মাটিতে সব লুটাইয়া পড়িয়া, এক হইয়া মাটিতে মিলাইয়া গেল। মাটি উর্ব্বর হইল বিনষ্ট প্রাণের কঙ্কালচূর্ণতে; তার পর শিখাপুচ্ছধারীরা উর্ব্বরা মাটির শ্যামশস্পে আত্মতৃপ্তি সাধন করিয়া চলিলেন।

গুরু-ভগবানের এই যে মারণ-মন্ত্র, ইহার সাধনা আজ দেশে নানা রকমে চলিয়াছে।

যেখানে মানুষ কিছু জানে না, বুঝে না, সেখানে সে বড়ই দুর্ব্বল। কি করিলে মানুষ যে ভগবান্ হইয়া যায় তাহা কাহারো জানা নাই, অথচ ভগবানের পায়ে সব দায় ফেলিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। ঠিক এমনি সন্ধি স্থলে গুরুঠাকুরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুঠাকুর যে ভগবান্ এইটি প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা আছে। এই সাধনাটির নাম ভেল্কী-সাধনা।

অনেকগুলি এই ভেল্কী-সাধনার রূপ আজ দেশে বিরাজ করিতেছে। তাহারই কয়েকটি রূপ আজ প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি। এই ভেল্কী-বাজির উদ্দেশ্য হইতেছে সর্ব্বপ্রথম তাক্ লাগাইয়া দেওয়া—কোনো একটা ব্যাপারে। তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিলেই মারণ-মন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। চেতনাকে বিহ্বল না করিতে পারিলে মারণ মন্ত্রের ক্রিয়া হয় না। একবার যদি সে কোনো রকমে বিহ্বল হইল, তার পর যে আমিই ভগবান্ তাহা বুঝাইতে কতক্ষণ লাগে! জড়কে তখন যাহা বলি তখন সে তো তাহাই করিবে! কর্ত্তা তো আমি, সে তো তখন করণ মাত্র!

যাহারা নিতান্ত সাধারণ ভাবে বংশানুক্রমিক পেশা হিসাবে এই ভগবান্ হইবার পেশা করিয়া আসিতেছে তাহাদের কথা বেশি বলিতে চাহি না। তাহার কারণ, এই শ্রেণীর পেশাদারেরা ঠিক সচেতন ভগবান্ নয়। তাহারা ও তাহাদের শিষ্যেরা একটা অভ্যাস হিসাবে এই কাজটি করিয়া চলিয়াছে। গুরু বছরে এক বার দুইবার আসেন, ফসল তোলার ঠিক পরটাতেই। দু'একদিন থাকিয়া দু'চারিটা সৎ উপদেশ দিয়া ও ভোজন-দক্ষিণা নিয়া তিনি চলিয়া যান, আর পশ্চাতে হয়ত এক-আধ টুকরা মন্ত্রও শিষ্যের কানে ফেলিয়া যান। মড়ায় মড়ায় কানাকানি হয়; তাহাতে কেউ কাহারো ক্ষতি করে না।

যেখানে ক্ষতি হইতেছে সেইখানকার লীলার কথাই বলি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তর পাশ দিয়াও যাঁহার মধ্যে পাশ্চাত্য-বিদ্যার প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা দেখা যায় না, বরং যিনি আরো বেশি করিয়া নানা রকমের গোঁড়ামি আর অদ্ভুত সংস্কারের ভক্ত হইয়া উঠিতে থাকেন, তাঁহার প্রতি সাধারণ লোকের ভারি একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। তাহার কারণ, সাধারণ লোকের মনে, তাহাদের নিজেদের এই সব গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের জন্য নিজেদের ওপর একটা অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস রহিয়াছে। তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, সুতরাং কি করিবে, সংস্কারের মোহ কাটাইতে পারে না বলিয়াই তাহারা জানে। কিন্তু হঠাৎ যখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল মণিটি তাহার এত বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়াও ওই সবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে থাকে, তখন তাহাকে সাধারণ লোকেরা শ্রদ্ধা করে, কারণ, ওই লোকটি তাহাদিগকে অন্তরের লজ্জা হইতে মুক্তি দেয়। তাহারা মনে মনে তখন বলে, তাহা হইলে পরে ওই হাঁচি এবং টিকটিকি সোজা জিনিষ নয়, আর আমাদের ওই মানিয়া-চলার মহত্বটাও বড় কম নয়—হুঁ! এই বলিয়া তাহারা আপনার কোন্ হৃত-গৌরবকে ফিরিয়া পায়, আর যাহারা ও-সব মানে না তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া আপনাদের স্থানটাকে সেই নীচে হইতে অনেকখানি উপরে টানিয়া তুলিয়া আনে। জড়তা আর এক পাক জড়াইয়া বসে।

এই যে জনসমাজের শ্রদ্ধার পাত্রটি, এটি যদি ব্রাহ্মণ হইয়া যান আর এতখানি বিদ্যার সঙ্গে যদি সাংখ্য-পাতঞ্জলের বুকনি একরাশি জড় করিতে পারেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি যোগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে কথা বলিতে সুরু করেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইনি গুরু-ভগবান্ হইয়া বসিতেছেন।

এই শ্রেণীর গুরু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট প্রণাম পাইয়া বাংলার এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া বিরাজ করেন। গুরু শিষ্যের দৃষ্টিতে ভগবান্ হইয়া উঠেন। কিন্তু তা-বলিয়া গুরুর গুরুতর প্রয়োজনগুলি কোথায় যাইবে? শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিয়া, নারী যে সর্ব্বপ্রকার পতন ও প্রলোভনের মূল কারণ তাহা বুঝাইয়াও তো তাঁহার বোঝা হয় না। তাই তাঁহার শিষ্যার প্রয়োজন হয়, সুন্দরী শিষ্যার সেবার মূল্য যে অনেকখানি তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বিধবা শিষ্যাদের যতই বেশি করিয়া পরপুরুষের সংস্রব বর্জ্জন করিবার শাসন চলিতে থাকে, তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার আকুলতাও ততই বাড়িয়া চলে। শিষ্যেরা ইহাকে গুরুর অপরিসীম কৃপা বলিয়া মনে করে। যারা চতুর হয়, জগতে তাহারা ভিক্ষাকে সেবার মত আদায় করিয়া লয়। যে অনুগ্রহ করে সেই আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিয়া ধন্য হইয়া যায়, এই চতুরের চাতুরীর প্রসাদে। তার পর একদিন আসে...কিন্তু দুর্ব্বলেরা এমনি অন্ধ যে, তখনো ওই মিথ্যা আশ্রয় ছাড়িতে উহারা ভয় পায়। তাই তখন উহারা এই বলিয়া সান্ত্বনা পায় যে ভাল মানুষকে সংসারে নানা নিন্দাই বহন করিতে হয়।

শাস্ত্রের ভেক্ষী দিয়া এই গুরু একটি সম্প্রদায়ের প্রাণকে মারিয়া রাখিয়াছেন। গুরুর আদেশ মত ইহারা পূজা-সন্ধ্যা করে, ক্রিয়া-কর্ম্ম করে, তার পর জাতিটা বাঁচিতেছে কি মরিতেছে, সমাজের কোনো সংস্কারের কোথাও প্রয়োজন আছে কি নাই, সেই সব বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনযাপন করিতে থাকে। তারা ভাবে, পরলোকের ইনসিওর্যান্সটা তারা বেশ পাকা করিয়া লইয়াছে, সুতরাং ফেল মারুক না এই দুনিয়া, তাহাতে তাহাদের কি আর হইবে!

ছোটবেলায় বেদের তামাসা দেখিতাম। সকলের সামনে বসিয়া বেদে তাহার খালিহাত দুটা দেখাইয়া লইয়া ভানুমতীর হাড়খানা ছোঁয়াইয়া 'আয় আয়' বলিয়া অদ্ভুত ভঙ্গী করিত, আর কোথা হইতে হাতের মুঠায় একটা পাখী আসিয়া আবির্ভূত হইত, হাঁ করিয়া মুখ দেখাইত, মুখে কিছুই নাই; কি যে মন্ত্র পড়িত আর মুখ হইতে ঝর ঝর করিয়া এক রাশি চক্‌চকে রূপার

টাকা ঝরিয়া পড়িত। তার পরক্ষণেই তামাসা দেখাইয়া মুখ-ভরা রূপার টাকার মালিক হাত পাতিয়া পয়সা ভিক্ষা চাহিত। সেই ছোট বেলায় ব্যাপারটা যে নিতান্তই ফাঁকির ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিতাম সকলেই, কারণ ঙলোকটা একটা সামান্য বেদে, আর সে স্পষ্টই খেলা দেখাইতেছে বলিয়া স্বীকার করিয়া বসিত।

কিন্তু কবি বলিয়াছেন, তুমি ভাব ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়! কি আশ্চর্য্য সত্য কথাটাই কবি বলিয়া ফেলিয়া-ছেন! বেদে কি জানিত যে তাহার ওই বাজিটার মধ্যে কতখানি যৌগিক বিভূতি রহিয়াছে আর আমরাই বা কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ওই বেদে কত বড় লোক! সে-কথা বুঝিতে পারা গেল যে-দিন অদ্ভুতানন্দের আবির্ভাব হইল তিব্বতের 'স্বরূপগঞ্জ' হইতে। অদ্ভুতা-নন্দ বেদে নন, তিনি ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, তার উপর গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী। সুতরাং তিনি যেদিন দেখাইতে লাগিলেন যে আকাশের নীলিমা হইতে খাঁটী পদ্মমধু তৈরী হয়, আলোকের কণা হইতে তিন লক্ষ টাকার হীরা বাহির হয়, এবং তাঁহার দেহের লোমকূপ হইতে বড় বড় সব দামী পাথর বাহির হয়, তখন তাহা যে ক[illegible] বড় যোগের ব্যাপার তাহা বুঝিতে এক নিমেষও লাগি[illegible] না। আর তিনি যে সূক্ষ্ম শরীরে যখন-তখন এখান হইতে তিব্বতে চলিয়া যান তাহাও বুঝিতে কোনো ক্লেশ হইল না। কারণ যেদিন রাতে তিব্বতে যান সেদিন তাঁহার ঘরে ভিতর হইতে তালা বন্ধ থাকে এবং সকালে যখন বাহির হইয়া আসেন তখন তাঁহার হাতে তিব্বতের পত্র থাকে। অথচ গণপতি এত করিয়া হাতে-পায়ে বাঁধা পড়িয়া সিন্ধুকে বন্ধ হইয়াও তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি বারের তরে যোগী নাম পাইল না। ব্যবসা করিতে গিয়া লোকটা ভগবান্ হওয়ার পথটাকে বন্ধ করিয়া দিল। ব্যবসার এতটুকু চেষ্টা না করিয়াও যে একটা বৃহৎ রকমের ব্যবসা চালান যায় তাহা সে বেচারী জানিত না বোধ হয়।

এই অদ্ভুতানন্দেরা কি করিতেছেন?

বড় বড় বিদ্বানেরা অদ্ভুতানন্দের কাছে গিয়া থ' হইয়া গেছেন। কারণ অদ্ভুতানন্দের সঙ্গে তর্ক চলে না, তাঁহার কথায় সন্দেহ চলে না। কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলেন, ও কি তোমাদের বিজ্ঞানের কর্ম্ম বাপ! আমি তোমাদের বিদ্যার ধার ধারি না, তবে এ বিদ্যা তোমাদের ওই বিজ্ঞানের বাবা আসিলেও আয়ত্ত করিতে পারিবে না, ঠিক জানিয়ো। তার পর তিনি এই বিদ্যা যাহাতে আবার ভারতবর্ষে প্রচার হয় তাহার চেষ্টার কথা বলেন; বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার বৃহৎ কল্পনা জাগে। বিদ্বানেরা যোগ ও দর্শনের দ্বারা অদ্ভুতানন্দকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়া যান, আর যোগী বাবার ধনী চেলারা মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য এবং স্বরূপগঞ্জ হইতে বহুমূল্য সব যন্ত্র-পাতি আনাইবার জন্য বাবার শ্রীচরণে অর্থ ঢালিয়া দিতে থাকেন। মন্দির যেদিন হইবে সেদিন ওই সব যন্ত্রের কৃপায় সব টাকা সুদে-আসলে উঠিয়া আসিবেই, এ বিশ্বাস তাঁহাদের আছে।

ততদিন অদ্ভুতানন্দের বড় বড় আশ্রম সিমলা এবং পুরী, কাশী এবং বৃন্দাবনে তৈরী হইতে থাকে। ভগবানের সেবা করিয়া বৎসেরা কৃতকৃতার্থ হয়, গুরুদেবও সিল্কের জামা-কাপড়ে, উত্তম শয্যায়, ছানা-ক্ষীর-নবনীত-সেবায় প্রসন্ন হইয়া উঠিতে থাকেন—শিষ্যেরাও অদ্ভুতানন্দের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। বিদ্বানেরা তাঁহার বিদ্যার আর তল পায় না। সুতরাং তাঁহার জীবনী লিখিতে বসিয়া যায়।

এমনি করিয়া অদ্ভুতানন্দেরা আপনাদের অদ্ভুত কর্ম্মটিকে অসমাপ্ত রাখিয়াই একদিন বোধ করি লোকান্তরের বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের কাজে বাহির হইয়া পড়েন; তখন তাঁহার অসমাপ্ত কীর্ত্তিই তাঁহাকে চিরতরে মহান্ করিয়া রাখিয়া যায়। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, পূজা ইত্যাদি চলিতে থাকে কিছুকাল। ভগবান্দের এই সব সঙ্কল্প কেনই বা জাগে, কেনই বা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা কে জানে!

আর একদল ভগবান্ আজকাল পীরিতির পসরা লইয়া এই দেশের নানাস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ইঁহারা প্রত্যেকেই রাসেশ্বর। দুর্বলের সামনে জোর-গলায় কথা বলিতে পারিলেই দুর্বল নত হইয়া পড়ে। গুরুবাতিকগ্রস্ত শিষ্যমণ্ডলীর যদি এক সঙ্গে ফটো লওয়া যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে উহাদের মধ্যে কেমন একটা ব্যক্তিত্বহীনতার স্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিবে। ইঁহারা পুরুষ হইয়া নারীর মতই অত্যন্ত বেশি নির্ভরপ্রবণ। এই ভগবানেরা এই সব শিষ্য এবং শিষ্যা লইয়া এক অপূর্ব্ব লীলার সূত্রপাত করিয়াছেন।

এই লীলানন্দেরা হিপ্‌নটিজ্‌মের অদ্ভুত মাহাত্ম্যে আমাদের দেশে ভারি মজার ব্যাপার করিয়া চলিয়াছেন। লীলানন্দ বলেন, আমি ভগবান্। এবার কলিযুগে আর তোদের কোনো দুঃখ রাখিব না। যে যে-ভাবে আনন্দ চাহিবি, পাইতে কষ্ট হইবে না। কৃপা করিয়া এবারে আর কোনো তপস্যারই প্রয়োজন রাখিব না। আমাকে যে ধ্যান করিবে অনায়াসে সে আমাকে পাইবে।

এইসব শক্তিহীন দুর্ব্বল শিষ্যের দল একথা শুনিয়াই গলিয়া যায়। বিনা সাধনায় সিদ্ধির মত লোভীর পক্ষে লোভনীয় আর কি আছে?

লীলানন্দের যোগশক্তির বলে হু হু করিয়া শিষ্য বাড়িতে থাকে। তাহারা দু দিন তিন দিনের সাধনায় এক একজন কি যে হইয়া যায় ভাবিলে আশ্চর্য্য লাগে। কেউ শয়নে স্বপ্নে কেবলি গুরু-ভগবান্‌কে দেখিতে পায়; আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদে; কেউ বহুদূরে থাকিয়া তাঁহার স্পর্শ পায়, ; কেহ ঘুমাইতে গিয়া তাঁহাকেই বুকের কাছে পায়। কেহ স্বামীভাবে, কেহ সখাভাবে ইত্যাদি নানা ভাবে তাঁহাকে পাইতে থাকে। গুরু-ভগবানের আশ্চর্য্য বিভূতির পরিচয় পাইয়া লোকেরা অবাক্ হইয়া থাকে। গুরু-ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপায় কাহারো মেরুদণ্ডের ভিতর, কাহারো আরো কোথাও ভাগবতী শক্তি কেমন একটা নড়াচড়া করিতে থাকে।

ফলে, লীলানন্দের আশ্রম শক্তিতে ভরিয়া যায়। লীলানন্দের চারিপাশে লীলাময়ী গোপিকারা বিরাজ করেন। সকলেই ভাবাবিষ্ট। তাঁহাদের পাশেই কতকগুলি ফ্যাঁকাসে-পানা শিষ্যও বসিয়া আছে বেকুবের মত, কখনো ঠাকুরের প্রেমলীলা দেখিয়া আহা-হা করে, কখনো কাঁদে। কেন যে আহা-হা করে, কেন যে কাঁদে তাহা কে জানে!

সাধারণ কোনো সামাজিক মানুষের আশে পাশে তাহার অত্যন্ত আপনার দু-চারিটি নারীকে যদি আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের রঙ-বেরঙের নানা রকম সিদ্ধান্তের আর অন্ত থাকে না; আমাদের বৈঠকী মজলিসে আমাদের চোখে-মুখের ইঙ্গিতে কত কথাই আমরা বলিতে চাই, বলি। এই আমরাই যখন লীলানন্দের প্রণয়লীলা দেখি, তখন ভক্তিতে বিস্ময়ে গদগদ হইয়া যাই। তাহার কারণ, লীলানন্দ যাহা করেন তাহা তো সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নহে; স্বয়ং ভগবান তাঁহাদের আত্মাকে লইয়া বিহার করেন। আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি শুধু আপনার মলিনসংস্কার দিয়া ভাগবত রাসলীলাকে কদর্য্য করিয়া দেখে! কৃষ্ণলীলা কি সহজ কথা!

লীলানন্দের ভেল্কী তাঁহার ওই জোর করিয়া সব-করার মধ্যে। সকলের সমুখেই লীলানন্দ লীলাময়ীকে বুকে টানিয়া লন। আমরা অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি—আর দুষ্ট মনকে শাসন করিতে করিতে বুঝাইতে থাকি এটা যোগের অতি উচ্চস্তরের কথা, বেদেও তাহার মর্ম্ম তেমন করিয়া ফোটে নাই! লীলানন্দের নিকট নানা দূর দেশ হইতে অগণিত ভক্তের ব্যাকুল পত্র আসে তাহারা যে সেখানে বসিয়া বসিয়া এই ভগবানকে আপন আপন ভাবানুযায়ী পাইতেছে, তিনি যে তাহাদের নিকটেও স্থূলশরীরে বিরাজ করিতেছেন একথা তাহাতে লেখা থাকে। গুরু-ভগবান্ এই সব পত্র ডাকঘরের ছাপ-দেওয়া খামশুদ্ধ দেখান সকলকে, আর বড় বড় পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া গিয়া ভগবানের পায় লুটাইয়া পড়ে। তবে যারা ভগবান্‌কে এমন সশরীরে সেই দূর দেশেও পায় তারাই কেন যে আবার এত পত্র দেয় ডাকে, তাহার কথা ভাবিবার অবসর কাহারো হয় না।

এই লীলানন্দ, ভোলানন্দ, দুর্গমানন্দদের এই আশ্চর্য্য করুণার উৎপাতে বহু সংসার ধ্বংস হইয়া গেল। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রেম-যমুনার পারে লইয়া যাইতেই তো আসা তাঁর! ঠাকুর ভাগবত সত্তায় মজিয়া গিয়া নানা রকমের রূপকে কথা বলেন; আমরা ঠাকুরের কথা কি বুঝি! দেখিতে পাই, কথার রসে শিষ্যাদের ঢল ঢল দেহে হিল্লোল বহিয়া যায়। চোখে-মুখে এক আশ্চর্য্য ভাবের খেলা। স্বামী স্ত্রীকে ঠাকুরের চরণে দান করিয়া বৈরাগী হইয়া যায়, স্ত্রীও স্বামীকে অনেক সময় চিনিতে পারে না। দুষ্ট লোকে বলে, হিপ্‌নটিজ্‌ম্। ভক্তেরা বলে, গুরুকৃপা হইলে কি সংসার সমাজ আর তাহার ভালমন্দ থাকে! সব ভাসিয়া যায়!

তার পর মাঝে মাঝে হাঁসপাতালে উন্মাদ অবস্থায়, মৃত্যুশয্যায় কতকগুলি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যারা শোনে, দুর্ভাগিনীদের কথা শুনিয়া শিহরিয়া ওঠে। কিন্তু সে-সব কথায় আমাদের ভক্তি তো টলে না, এই সব আনন্দময়দের দানবী আনন্দেরও অবসান ঘটে না, ভক্তিমতীদের আশ্রয়-কামনারও শেষ হয় না!

কিছু পরিমাণ শাস্ত্রবাক্যের ভেল্কী, কিছু ম্যাজিক, কিছু হিপ্‌নটিজ্‌ম্, কিছু চালাকী, আর অত্যন্ত জোর-বিশ্বাসের ভঙ্গীতে নিজের অসাধারণ শক্তির নানা রকমের কাহিনী বলিতে পারা, সেই সঙ্গে একটুখানি কৃপা করিয়া চলার ভাব,—এই সব মিলাইয়া ভগবান্। আজকাল সমাজ এই ভগবানের পূজায় লাগিয়াছে।

পুরাতন কাহিনীতে পাই গুরুর এক রূপ, আর আজ পাই তাঁহার আর এক রূপ। কোথা হইতে মানুষ কোথায় আসিয়াছে তার একখানি অভিনব আলেখ্য! মনুষ্যত্বের অগ্নিমন্ত্রী, অত্যাচারের দণ্ডদাতা, অন্যায়ের রুদ্রশাসক, সমাজ ও সংসারের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ, এক একটি বিশালহৃদয় মানুষ ছিলেন সমাজের গুরু। আর আজ বিলাসী, ভোগাসক্তির অবতার, কামের অভিনব পূজারী এই গুরু-ভগবান্। হিন্দুসমাজ তবু গুরু-মোহান্ত লইয়া শাস্ত্রের তর্ক উত্থাপন করে, শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রাচারী ছিলেন এই নজীর দেখাইয়া ব্যাভিচারকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে! লজ্জা এই রাজ্য হইতে লজ্জা পাইয়া পলাইয়াছে।

মানুষের সহজ বিচার-বুদ্ধিটা একেবারে দেউলে হইয়া গেছে! গাছ-পাথরের পূজা করিতে করিতে বুদ্ধির এমন দুর্গতি হইবে না তো কি হইবে আর! মানুষকে ভগবান বলিতে ইহাদের বাধিবে কেন!

যাহা সত্য নয় তাহাকে সত্য বলিয়া পূজা করিলে তাহার শাস্তি ভোগ করিতেই হয়। মানুষ যত বড়ই হোক্, যত মহৎই হোক, যত বড় কল্যাণকামীই হোক, তাহাকে তো ভগবান্ বলিয়া চালানো সত্যনিষ্ঠা নয়। কি জানি সমাজের কোন্ মহামঙ্গলের খাতিরে এই অসত্যকেই আমরা স্থাপন করিলাম সর্ব্বত্র। পতি পরমগুরু হইলেন, পিতামাতা পরমগুরু হইলেন, তাহার উপর গুরুঠাকুর একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেন। তাহারই ফল আজ ভোগ করিতেছি সর্ব্বত্র।

মানুষের পূজা করিতে করিতে মনুষ্যত্ব লোপ পাইল আমাদের। পিতামাতার গুরুত্বের অহমিকা এবং তাহার চাপ রহিল, কিন্তু পিতামাতাকে দেবত্বে উপনীত করিবার সাধনা রহিল না। গুরুঠাকুরের ভগবত্তার শমন জারি চলিল সজোরেই, কিন্তু গুরু আপনাকে ভাগবত-সত্তায় তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না।

তাই যাহাকে দেবতা বলিয়া, ঠাকুর বলিয়া পূজা করিতে লাগিলাম সে দিনে দিনে যুগে যুগে পতনের নিম্ন সোপানে নামিয়া আসিতে লাগিল, আর পূজারীরাও চলিল সেই সঙ্গে। তাই দেশে আজ দেবতাও নাই, মানুষও নাই, তবু পূজার ঠাট তেমনি আছে। এই গুরু-পূজার মোহের কথা মনে পড়ে—আর আশ্চর্য্য হইয়া যাই। 'গুরুদেব' না বলিতে পারিলে যেন আমাদের শান্তিই আসে না মনে। তাই যাঁহার মধ্যে আমরা একটু কিছু বড় দেখিতে পাই তাঁহাকেই গুরুদেব বলিয়া না ডাকিতে

পারিলে আমাদের সবটা ভক্তিই যেন ব্যর্থ হইল বলিয়া মনে করি। যে-সম্প্রদায়ে এই গুরু-ব্যবসার প্রতি কণামাত্রও শ্রদ্ধা নাই, সেই সম্প্রদায়েও দেখিতে পাই, 'গুরুদেব' তৈরী হইয়া গেছে। আমাদের পুরাদমে গুরুর দশা চলিতেছে।

মানুষ সর্ব্বত্রই মহত্ত্বের এবং বিরাটের সন্ধানী। আপনার অন্তরসত্তাকে সে বৃহৎ করিয়া অসীম করিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, তাই সে যেখানে তাহার প্রকাশ দেখে সেখানে আপনাকে নিবেদন করে। তাহারি নাম পূজা। কিন্তু পূজা আর দাসত্ব তো এক বস্তু নয়। সে যাই হৌক, আমাদের দেশে কেন, মানব সমাজে সব দেশেই কোনো না কোনো কালে এই সন্ধান এক বিচিত্র রূপ ধরিয়া বসে আর তাহাতেই মানুষের পতন হয়। আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে বাঁধিয়া ধরিবার প্রয়াস মানুষকে একদিন মিথ্যার রাজ্যে টানিয়া লইয়া আসে।

মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দেবত্বের ভাস্বর জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। পিতা কোথাও পরম দেবচরিত্র, মাতা কোথাও মহীয়সী দেবী, রাজা কোথাও সত্যধর্ম্মপালক প্রজার সর্ব্বকল্যাণকারী, পতি কোথাও আদর্শ পুরুষ, গুরু কোথাও সত্যদৃষ্টিতে মহান—একথা কে অস্বীকার করিবে। কিন্তু ইহার পর যে-শাস্ত্রকার শ্লোক রচনা করিলেন যে পতিমাত্রই পরম দেবতা, পিতামাতা-মাত্রই সাক্ষাৎ হর-গৌরী, রাজামাত্রই স্বয়ং বিষ্ণু আর গুরুমাত্রই একেবারে ভববন্ধন-মোচনকারী, অজ্ঞানান্ধকার নাশন ভগবান, সেই শাস্ত্রকারকে মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কি বলিতে পারি? জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে নানাভাবে শাসনে রাখিবার বিচিত্র ব্যবস্থা হয়ত হইল কিন্তু সত্য সেদিন খর্ব্বিত হইল। মানুষের সঙ্গে মানুষের যাহা সত্য সম্বন্ধ তাহা সেদিন মিথ্যা আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন হইল। সেদিন হইতে মানুষের সত্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিকৃত হইল; কারণ, মানুষের দাসত্বে মানুষ মানুষ হইতে পারে না।

যাহা বৃহৎ তাহার পূজা করিয়া, তাহার জন্য সাধনা করিয়াই মানুষ বড় হইয়া থাকে। পাথরকে ভগবান্ বলিলেই ভগবান্ পাথর হইয়া যান না, এই সোজা সত্যটা এতদিনেও মর্ম্মগোচর হইল না আমাদের। ভগবান্‌কে মানুষ করিলে মানুষ ভগবান্ হয় না এটা তবু আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয়। তাহার কারণ ভর দিয়া চলিবার ভগবান্ চাই, অথচ মানুষকে ভগবান্ না করিলে ভগবান্ এমন কথায় কথায় কোথায় পাওয়া যায়?

আমাদের এই গুরুর দশা কাটিবে কেমন করিয়া তাহাই ভাবি। দেশে দেশে এই গুরুবাদকে বাদ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল মানুষ, আর আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে খণ্ডাবতার আর পূর্ণাবতারের সংখ্যা কেবলি বাড়িয়া চলিল! সবদেশে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত স্বতন্ত্রতার বাণী প্রচারিত হইতেছে আর আমাদের ঘরে ঘরে কেবলি পরতন্ত্রতার শ্লোক আওড়ান চলিতেছে!...

একটা জাতিকে-জাতি যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং জীবনীশক্তিহীন না হইয়া পড়ে, কখনো গুরুদাসত্ব এমন প্রবল হইতে পারে না; একদল ভণ্ডের প্রতাপ কখনো এতখানি বাড়িতে পারে না। মানুষ লাঠিতে ভর দিয়া বাঁচে না, তাহার সত্যকার শক্তি তাহার নিজের পায়ে, এই কথাটি এমন করিয়া মানুষ ভুলিতেই পারে না, যদি না তাহার শক্তি একেবারেই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই অন্তহীন অবসন্নতাগ্রস্ত জাতি কি করিলে শক্তির পথে পা দিবে তাহা কে জানে!...ইতি শ্রীগুরু!

—উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩৩

কবলুতি

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষাকাল, ছুটির দিন। চারটে বেজে গেল। পথে কাদা, মাথার উপর মেঘ, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি। বেরুতে আর ইচ্ছা হল না। খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম।

মনটা অন্যমনস্ক। একটু আগে জটিল ব্রহ্মচারী এসেছিলেন,—ব্রহ্ম সম্বন্ধে এমন জোট পাকিয়ে দিয়ে গেলেন, কিছুতেই তা ছাড়াতে পারি না।

ব্রহ্মচারী বাঙ্গালী—পায়দল পাঞ্জাবে পৌঁছে গেছেন,—কবে যে তা কেউ বলতে পারে না। বলেন—"রণজিৎ সিং তখন বেঁচে।" দীর্ঘাকৃতি, মাথায় বিড়ে পাকানো জটার টোপোর.—সর্ব্বসাকুল্যে মানুষটি আট ফুট। হাত দু'খানা যেন লোহা-পেটা হাত। পরিধান—গেরুয়া। বলেন—"যা দেখছো এর কিছুই নেই—সব মায়া; রাজর্ষি জনক সেটা বুঝেছিলেন! তাই তখন খুন করলে ফাঁসি হত না। বিধর্ম্মী এসে জ্ঞানীদের বিপদ বাড়ালে।" তারপর তারস্বরে "তারা" বলেই গভীর নিঃশ্বাস ছাড়েন, চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে,—চার দিকে চান। দেখলে ভয় হয়। তাঁর কথাই মগজ দখল করে ছিল।

এক ছাতার মধ্যে আশুবাবু আর হরেন বাবু, ভেজাটা ভাগাভাগী করে,—আধ-ভেজা অবস্থায় হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়লেন।

ছাতা মুড়তে মুড়তে হরেন বাবু বললেন—"বাপ্—সারাদিন কি বাড়িতে বসে থাকা যায়,—boring. ওঁরা তো এখন আর প্রিয়া নন,—পরিবার,—দুর্নিবার! তার ওপর ছেলে মেয়েগুলোর উৎপাতে চোখ বোজবার জো আছে! যারা কলে কি রেলে কাজ করে—তারাই পারে। এক সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র—বাপ্! বেটারা পাঞ্জাবে জন্মেছে—আওয়াজ কি,—এক একটি পাঞ্চজন্য! আর ও-যন্তর বাজলেই তো লড়াই!"—বললেন।

"ব্যাপার কি?"

"আরে মশাই বাড়িতে বলেন—'একদিন আর সইতে সামলাতে পার না'—ইত্যাদি। অর্থাৎ ছ'দিন চাকরি সামলাই আর ছুটির দিনটি ছেলেমেয়ে সামলাই!—বেশ, তাই হোক্। হচ্ছিলও তাই। মানুষ কতক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে মশাই? মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করে যেই চোখ বুঝতে যাই, বেটার ছেলেরা চখে আঙুল দেয়। দূর করো,—বেরিয়ে পড়লুম।"

"বেশ করেছেন।"

তিনি আপন মনে মৃদুকণ্ঠে বললেন—"বেশ যা করেছি তা আমিই জানি—"

সে কথায় কান না দিয়ে দ্বিতীয়টির দিকে চেয়ে বললুম—"আশুবাবুরো বলবার কিছু আছে নাকি?"

তিনি দু'কসে একটু হাসির কসি টানলেন মাত্র।

হরেন বাবু বললেন—"উনি আবার বলবেন কি?"

"কেনো—ওঁর-ও তো ছ'টি।"

"বুদ্ধিটা যে ওঁর বয়সের অনেক এগিয়ে এসে পৌঁচেছিল। বিবাহের বহু পূর্ব্বেই ওসব উৎপাৎ উনি অনুমান করে, তথা স্বীকার করে রেখে দিছলেন,—কাজেই ওসব সহজ হয়ে আছে।"

"ওকি বলছেন হরেন বাবু—অনুমানে কি আঘাত উপলব্ধি করা যায়—কানে কি প্রাণে কি পৃষ্ঠে?"

"যায় না? খুব যায়। suggestion এ বড় বড় রোগ সারে কি করে? দিন রাত বজ্রাঘাত হচ্ছে ভাবলে বজ্রনির্ঘোষগুলো ঝিঁঝির ডাকের মত সহজ হয়ে দাঁড়ায়

সয়ে যায়। আশুবাবুর বাসায় বুঝি আপনার যাতায়াত নেই? কি বিচক্ষণ লোক মশাই! রাম রাবণের যুদ্ধে যে গড়ের বাদ্যি বেজেছিল, ওঁর বাড়িতে তার যন্ত্রগুলির model (ছাঁচ) মজুদ। একটা বিকট ব্যাপারকে সহজ করে নেবার কি সুন্দর উপায়টাই করে রেখেছেন! ওঁর ছেলে মেয়েগুলির নাম শুনলেই বুঝতে পারবেন,—তুরী, ভেরী, কাড়া, নাকাড়া, দামামা, দগড়া! আবার এই ছয় যন্ত্রের ঐক্যতান যা দাঁড়ায় তা জয়জয়ন্তী ঝাঁপতাল! আর উনি তাদের দু'দু'বচরের ফাঁকতালে এক একটিতে পরিপক্ক হয়ে, তাতে নিজের সুর মিশিয়ে স্বয়ং দাঁড়িয়ে গেছেন—সপ্তস্বরা। গিয়ে দেখি—একটা ঐক্যতান রোলের মধ্যে বোলের মত হাঁ! জালে পড়া ঝাঁঝির ভেতর থেকে মাছ টেনে বার করবার মত' ওঁকেও টেনে বার করে আনতে হয়েছে মশাই!"

আশুবাবুর দিকে চাইলুম। তিনি নিঃশব্দ হাস্যে বললেন—"যারা জোর করে আসেনি—যাদের আনা হয়েছে, তাদের উৎপাৎ তো সইতেই হবে।"

হরেন বাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন —"আহা—আমরা এতদিন বেমালুম সাধুসঙ্গ করেআসছি! এটা শ্রীভাগবতের কোন্ অধ্যায় আশুবাবু?—দূর হোক্‌গে, বেটার ছেলেরা চোখ গেলে দেয় দিক্—আর কিছু বলছি না। দেয়ই যদি—অন্তত বেটাদের বদ-সুরৎ দেখতে হবে না তো,—যথা লাভ! শাস্ত্রের সেরা অন্ন—ভিক্ষান্ন—সেটাও সহজ-লভ্য হবে। যাক্ দুশ্চিন্তা গেল।"

"চোখই বা যাবে কেনো হরেন বাবু?"

"না:—শুধু চোখই বা যাবে কেনো! এই যে সেদিন খুঁতে হারামজাদা নাকটায় যে কামড় বসিয়েছিল, গলাটা টিপে না ধরলে তুলে তো নিছলোই। চক্ষু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সদুদ্দেশ্য বুঝতে পারি; আচ্ছা নাক সম্বন্ধেও কিছু আছে নাকি? শাস্ত্র তো সব কিছু বাতলায়। থাকে তো নাকটাও না হয় ঠাকুরদের দিয়ে রাখি।"

হাসি চেপে বললুম—"ছেলে মেয়ের একটু উৎপাতে এত্তো ভয় পাচ্ছেন কেনো?"

"না:—আর তো ভয় পাচ্ছি না। সাধুসঙ্গের ফল যাবে কোথায়,—অকুতোভয় করে দেছেন। দুটি ছাটার বেরিয়ে ভবিষ্যৎটা আর নষ্ট করব না। পণ্ডিতদের কথা মনেই পড়েনি—"বালক-নারায়ণ, ওরা সর্ব্বজ্ঞ।" বড় ঠিক্ কথা মশাই। আমার ওই সর্ব্বজ্ঞ বেটারাও জানে—একচক্ষু ছিল বলেই তো রণজিৎ সিং মহারাজা হতে পেরেছিলেন, আর এত বড় পাঞ্জাবটা সুশাসনে রাখতে পেরেছিলেন। অতএব বাপের দুই চক্ষু নিতে পারলে, নিশ্চয়ই তাদের রাম-রাজ্য হবে!—আমি অজ্ঞান, কিসে কি হয় বুঝতে পারি না—বালক নই কিনা—ভয় পাই। কিন্তু ওই বালক বিচ্ছু বেটারা সব বোঝে,—নারায়ণ কিনা!"

এবার আশুবাবুও হেসে ফেললেন।

বললুম—"হরেন বাবু সত্যি বলুন তো—ছেলেদের উৎপাতের ওপর আরো কিছু আছে কিনা? এই দুর্দ্দিনে ভারত যে আর একখানা "বৈরাগ্য শতক" পাবে বলে বোধ হচ্ছে!"

"অনেকটা তাই বটে—ভাগ্য সেই দিকেই ঝুঁকেছে দাদা! চাকরিটেও ডেভেনপোর্টের রিপোর্টে রিপোর্টে দুর্গানামের ওপর দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে! এদিকে বাড়ীতে—"

"ওটাকে অত বড় করে দেখছেন কেনো?"

"আর দেখছি কেনো! উদিকে যে দেখিয়েছে মশাই! ভুঁদুড়ি হারামজাদি বেজায় পেটরোগা মেয়ে, —পুঁয়ে পাজির ঘাড়ে না পড়ে—চড়টা কিনা পড়বি তো পড় ভুঁদুড়ির পেটেই পড়লো! কি অদৃষ্ট মশাই! আজ আর ও-মুখো হচ্ছি না।"

আশুবাবু সশব্দে হেসে উঠলেন।

অনেক কষ্টে গম্ভীর হয়ে বললুম—"এ হাসির কথা নয় আশুবাবু। অবস্থাটা খুবই সঙ্গিন। এই সব অবস্থার মধ্যেই বৈরাগ্যের বীজ আত্মগোপন করে থাকে, শেষ গৃহত্যাগ করিয়ে ছাড়ে। বুদ্ধ বা চৈতন্যের এর চেয়ে কি এমন বড় কারণ ঘটেছিল? তাঁরা—ভাবের ওপর ভেসে-

ছিলেন, এর ভিত্ যে নিরেটের ওপর—এ যে বিষম বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাপার!”

“না বিজন বাবু, সে ভয় করবেন না। বুদ্ধ চৈতন্য যা করে গেছেন, তার ঢের ওপর আমি করে চুকেছি। তাঁদের খাটো করা হবে বলেই প্রকাশ করি না। আপনারা বলাচ্ছেন তাই বলি—স্বগৃহ ত্যাগ, ইস্কুলগৃহ ত্যাগ, শ্বশুরগৃহ ত্যাগ, পত্নী ত্যাগ, দেশ ত্যাগ, এস্তোক কাশী ত্যাগ গুরু ত্যাগ করে “র‍্যাগ্” নিয়ে “ভ্যাগ্” হয়ে শেষ আবার এই শ্বাপদসঙ্কুল সোঁদোর-বনে ঢুকে পড়েছি। এখন tired (শ্রান্ত)। দেহ ত্যাগটাই হাতে রেখেছি,—আর ভালো লাগছে না।”

কুলবধূর গভীর বেদনা-ভরা মৃদু ক্রন্দনের মত বাইরের ঝিমঝিমিনি বৃষ্টির সুরটা, হরেন বাবুর শেষ কথাগুলির সঙ্গে সুর মিশিয়ে আমার প্রাণের তারে আঘাত করে হৃদয়টাকে ব্যথায় ভরে দিলে। আশুবাবুর চাপা হাসি আসলেই ভাল লাগলো না।

* *

*

বৃষ্টি চেপে এলো। চাকরটা বেলাবেলি ল্যাম্প জেলে দিলে।

বললুম—“যা, গরম গরম চাল কড়াই ভাজা নিয়ে আয়। বাড়িতে বল্—বেশ করে তেলনুন মেখে দেয়। কাঁচা লঙ্কাও আনিস্। তারপর চা আর তাওয়াদার তামাক।”

আশুবাবু এতক্ষণে স্বইচ্ছায় কথা কইলেন,—“ইয়াঃ এই তো দরকার ছিল। পঞ্জিকায় আজ অমৃত-যোগ লেখাও আছে। এইবার মজলিস্ জমবে,—হরেন বাবুর পুরাবৃত্ত শুনতে হবে।”

“সে বান্দা আমায় পাননি। সাধুদের আমি খুব চিনি,—বড় ভয় করি আশুবাবু। যা বলেছি—বহুৎ। সেয়না সাজলে চলবে না মশাই। আপনারাও যদি নিজের নিজের পূর্ব্ব ইতিহাস ঠিক্ ঠিক্ শোনাতে অঙ্গিকার করেন তো রাজি আছি।”

“ইতিহাস যদি না থাকে?”

“আছে বইকি মশাই। মহাশয় লোকদের এতটা সামান্য লোক ভাবতে সাহস হয় না,—অপরাধ মনে করি। এই পাঞ্জাবে পদধূলিটা কি সূত্রে আর কেমন করে এসে পৌঁছল, সেইটে বললেই হবে।”

“খুব সোজা কথা,—পেটের দায়ে—চাকরির চেষ্টায়।”

“আশুবাবু, কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরির মাঝ-মধ্যিখানে, কি মিউটিনির মাঠ ভেঙে, পাঞ্জাবে আসার মতো বাঙ্গালীর পেটের জ্বালা ধরেনি,—টাকায় তখন মোন দেড়েক চাল মিলতো, সকলেরি একটু আধটু ধান জমিও ছিলো, চাকরির মোহে সেটা কেউ don’t care (মারো গোলি) করেনি। হাঁটা পথে কি জল-পথে, ঠ্যাঙাড়ের ভিড় ঠেলে, এই লম্বাপাড়ি, সে-জাত দেয় না যাদের—“ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ।” তবে শেষটা যাঁরা বেজায় ধর্ম্ম-প্রাণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ উইল করে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়তেন বটে; বাকি কেউ কেউ সাহেবদের সংশ্রবে চাকরি নিয়েও বেরিয়ে এসেছিলেন। দু’ দশজন অর্থলোভী মরিয়া লোকও আসেন। বাদ বাকিরা প্রায়ই “ইতিহাসওলা”। কথা দেন তো—এই উত্তম পুরুষ থেকে আরম্ভ করতে রাজি আছি।”

বললুম—“তথাস্তু, কি বলেন আশুবাবু?”

আশুবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন—“আপনিও যেমন! হরেন বাবুর বয়সই বেড়েছে,—ছেলেমানুষী যায় নি। বাঙ্গালীকে যেন পাঞ্জাবে আসতে নেই,—এলেই তার ইতিহাস থাকবে।”

হরেন। ভয় নেই, বিলিতী Baronএর অভয়বাণী আছে—Look into any man you please and you will find at least one dark spot that must be kept covered—ঘোরালো দাগ্টা চেপে গেলেই চলবে,—ইতি গুরুবাক্য।

চাকর চালকড়াই-ভাজা আর চা দিয়ে চলে গেল,—আশুবাবুর চলা সুরু হ’ল।

দু'গাল মুখে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা বেশ,—তোমাদেরই আগে শুনি।"

"ওঃ—"নগনস্ত" নীতি! যাক্—ক্ষমা করবেন, আপনাদের আর কষ্ট দেব না। এখন লে-মিজারেবল্ তো চলছে,—আমারি শুনুন,—বন্ধুদের একদিন বেরুবেই।"

এই বলে, এক গাল মুখে দিয়ে হরেন বাবু আরম্ভ করলেন—"দেখুন আমাদের শাস্ত্রটি কেবল বেড়াই বেঁধে গেছেন, তিনি বলেন—নিজের গুণগান করায় আর আত্মহত্যা করায় প্রভেদ নেই। কি মুস্কিল্ বলুন দিকি? হোক্‌গে, বাড়িতেও তো অপঘাৎ জীয়োনো রয়েছে,—নিজের হাতেই ভালো। শুনুন—

"এবার যা জমিয়ে ফেলেছি তা নাকি সোজা রাস্তায় বাইরে গিয়ে পড়েছে,—ফোঁটা মেরে তাকে ফাঁকি দেওয়া যায়না,—কবুল করলে যদি benefit of mercy মেলে—বিশেষ পাদ্‌রিদের সামনে, তাই চেষ্টা পাওয়া। অপরাধ এড়াতে পারিনি বলে—অনুতাপটাও না খোয়াই!

"বাপ ছিলেন সেকেলে সদরালা—শেষ সাত মেয়ের বে দিতে ফতুর হয়ে ফিরিওলা দাঁড়িয়ে গেলেন! তাঁরি একমাত্র পুত্র—এই শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ! তিনি আমাকে পাঁচ হাজারে ছেড়ে গা ঝেড়ে বসতে চাইলেন। তখন আগোড়পাড়ার ইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি—first boy—আমার বুদ্ধির প্রশংসাটা তার অনেক আগে সাত বচরেই সুরু হয়ে গিয়েছিল! বুদ্ধি জিনিসটা বচর-চাপা থাকেনা!

"দশানন দস্তিদারের পাঠশালে দাগা বুলুই। তিনি ছিলেন গুড়ুকের যম,—আমি ছিলুম তার সাজিয়ে, ক্রমে প্রাজ্ঞয় টানিয়েও দাঁড়িয়ে গেলুম! শেষটা কেষ্টা বেটা দিলে দেখিয়ে! গুরুমশায়ের নেত্র আর বেত্র একত্র হলে যে কুরুক্ষেত্র-যোগ ঘটে, তা আমার জানা ছিল। সুতরাং পায়ের সাহায্য নিতেই হল। যাই কোথা? ঢুকে পড়লুম গঙ্গাবাসীদের ঘরে। পেছনে গণ্ডা দুই ষণ্ডা ষণ্ডা পোড়ো। কি বিপদ—দোরের যে খিল্ নেই। ট্যাকে দাগা বুলোবার খড়ি ছিল, ধাঁ করে দোরের বাঁয়পিটে সাড়ে চুয়াত্তোর লিখে, ভেতরে ঢুকে ভেজিয়ে দিলুম। বেঁচে থাকুক্ হিন্দু শাস্ত্র, কোনো মিয়ার সাধ্যি হলনা দোর খোলে,—খুলেছেন কি জাহান্নম্! ওয়ারেণ্ট্ ফিরে যেতো মশাই! এমন ধর্ম্মটা কিনা বাবুদের সইলো না! এখন—চবস্‌-লকের (Chobbs lockএর) চাঁদমালা চাই! মতিচ্ছন্ন!

"চুলোয় যাক্, যে কথা বলছিলুম্, সেই সময় জমিদার যাদব চৌধুরী মশাই দৈবক্রমে—"পরের নায়েব" আওড়াতে আওড়াতে মনোহর মেদোকে মামলার মুসোবিদেব সুবিধে বাত্‌লাতে বাত্‌লাতে সেই ঘাটে ঢুক্‌ছিলেন। সব শুনে বললেন—বুদ্ধিটে দেখো মনোহর! হবেনা—সদরালার ছেলে। এইটুকু বাচ্চা—ধর্ম্মবিশ্বাসটাও লক্ষ্য করবার জিনিস্ হে। এ ছেলে গ্রামের মুখোজ্জ্বল করবে দেখে নিও। যা যা ছোঁড়ারা, দশাননকে বলিস্—আমি বলেছি ওকে যেন মারধোর্ না করে। এ লঙ্কা নয়।

"যাক্—বেঁচে গেলুম! কাজটা কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেলো,—কেষ্টা বেটাই পেলে। সেইদিন থেকে চৌধুরীর আমার ওপর ঝোঁক্। সেকেণ্ড ক্লাস্ পেরুতে দিলেন না, বাবাকে ধরে বসলেন—'মুড়কির সঙ্গে হরেনের বিবাহ দিতেই হবে, তাহ'লে বিষয় রক্ষা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ্ বুজতে পারি। ছেলেটা মানুষ নয়,' ইত্যাদি। তিনি মানুষ চান।

"বাবার থাবা বাগানোই ছিল। তিনি পেলেন—পাঁচহাজার, চৌধুরী পেলেন—মানুষ।

"তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসের সর্দ্দার! পেটের অসুখ ধরলো, বার্লি খাই আর ওয়েভার্লি পড়ি। হেড্-মাষ্টার গুরুচরণ বাবু বলে পাঠালেন, 'সোমবার ইস্কুলে আসা চাই-ই, ইনিস্পেক্টার আসবেন, তুমি না থাকলে ও-ক্লাস্ কাণা।' গেরোয় টানলে আর কি, যেতেই হ'ল।

"ইনিস্পেক্টর নীলাম্বর বাবু ছিলেন নভেম্বরের মত নব্য আর ডিসেম্বরের মত কড়া। ইংরিজি আওয়াজে কথা কইতেন। ফাষ্ট ক্লাসের ছেলেদের একটা idiomatic phraseএর (তুরুপী-বুলির) মানে জিজ্ঞাসা করেন,

—"Bolt from the blue বলতে তোমরা কি বোঝো, মানে কি?" তারা নাকি মাথা চুলকেছিল। তাতে গুরুচরণ বাবু লজ্জায় লাল মেরে যান। আমাদের ক্লাসে ঢুকেই সেই এক প্রশ্ন। গুরুচরণ বাবু কাতর নয়নে আমার দিকে চাইলেন। বুঝলুম তার মানে, বাঁচাও বাবা! Idiom কি কেবল ইংরিজিতেই আছে—বাংলায় নেই? বললুম—"বিনা মেঘে নীলাম্বরের হুড়ো।"

"নীলাম্বর বাবু কয়েক সেকেণ্ড আমার আপাদ মস্তক জোর-নজরে জরিপ্ করে, ক্লাস্ থেকে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলুম idiometic বাংলাটা বুঝতে পারেননি—idiotism ঠাউরেছেন।

"সেই থেকেই ত্যাগের সুরু। দুঃখু হলনা। যেখানে সমজদার নেই সেখানে বেকার থাকা। "বাজ" বললেই তো তাজ মিলতো—সে বোঝা বইবার অন্য জীব বহুৎ আছে! খতম্।

* *

*

শুনে বাবা তো বারুদ্। বললেন—রাস্‌কেল্, এই সামান্য কথাটার মানে বলতে পারলিনি,—ওর মধ্যে শক্ত কথাটা কি ছিলো? না ছিলো notwithstanding, না ছিলো prima facie, না ছিলো bonafide, ওতে ছিলো কিরে ডেভিল্? De jure থাকলে তো জীব বেরিয়েই যেতো। একটা parallelogram কি where withal থাকলেও মুখ দেখাতে পারতুম্। Blue মানে জান না, না bolt মানে জান না? নীলুর দোকানের ছিট্‌কিনী রে গাধা—নীলুর দোকানের ছিট্‌কিনী, এটা আর এলোনা? আমার ছেলে,—ইংরিজিতে,—উঃ terrible shame! ভেবেছিলুম অষ্টম পক্ষের ছেলে, একটা বড় কিছু হবেই, এখন ভাবছি খাবি কি করে!"

"বলে ফেললুম—'ভাববেন না, কিছু না হয়—সদরালাই হবো।'

"তখন—ত্যাগের সেলামী জমিতে পড়ে গেছি,—গড়েনের মুখ! বললেন—'হুঁ,—তবে বেরো।'

"দাশুরায়ের যুগ—অনুপ্রাসের আমোল,—গরমিল হবার জো নেই। বাবার বাহাত্তোর চলছিল, বললেন—"দেবত্তর করে যাবো।"

"ত্যাগ নম্বর টু—এসে গেলেন!"

"শ্বশুর—আদব দুরন্ত যাদব। তিনি এসে বললেন, "বেই, 'পরদেশী'—সেঁইয়া পর্য্যন্ত হতে পারে বটে, তার জবান্ নিয়ে হায়রান্ হও কেনো? ওতে আছে কি! এই আমি তো আর ইংরিজি পড়িনি, তা বলে কি হরিহর (arrear) বুঝিনা, না বউচোর (voucher) বুঝিনা. ও তোমার থ্যাঙ্ও বুঝি ব্যাঙ্ও বুঝি। ওতে আটকায় না, বেই, ওতে আটকায় না, আপ্‌সে এসে যায়। থাক্—হরেন এখন আমার কাছে সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম দেখুক্। ওকে তো আর চাকরি করতে হবেনা। মুড়কি তো আমার মেয়ে নয়,—ও-ও ছেলে, অর্দ্ধেক ওর।"

এই সময় আশুবাবু "বাপ্" বলে লাফিয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি?

কান দুটো দু'হাতে চেপে বললেন—"উঃ অন্যমনস্কে একটা আস্তো লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি হে,—প্রাণ যায়।"

হরেন বাবু বললেন—"দেখছেন কি,—সাধন ভজনের সাত্বিক শরীর—স্নিগ্ধ মধুর রসের অত্যাবশ্যক, ডজন্ খানেক লাড্ডু চাই।"

লাহোরের লছমন সিংএর দোকানের মিহিদানার লাড্ডু প্রসিদ্ধ,—দোকানটাও কাছে, চাকরটাকে একটা টাকা দিয়ে হুকুম করলুম—ছুটে যাবি ছুটে আসবি। সে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু একটু ঠাণ্ডা হয়ে হাত নাবিয়ে বললেন—"হরেন বাবু বাড়ী ফেরবার রাস্তা মেরে এসেছেন, ওঁর তরেই তাই—"

"সাধু সাধু!"

বললুম—"সোজা কথায় বললেই হ'ত।"

হরেন বাবু বললেন—"ভুল করেছেন বিজন বাবু, আপনাদের শাস্ত্র সোজা করে কোনো দিন কোনো কথা বলেন নি,—ওটা সনাতন ধারা! ওঁর ভুল হবার জো নেই।"

লাড্ডু পৌঁছে গেল। (হাপ্ টাইম্)

পথের কান্না

শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু বহু দিনের সেই পথটি, যুগযুগান্তরের পথিকের পায়ের ধূলায় ধূসর সেই পথ। কত শত যুগ ধরে মানব যাত্রী চলেছে সেই পথ বেয়ে। এক অসীম অন্ধকার থেকে সেই পথ বের হয়েছে, মিলিয়ে গেছে তেম্‌নি এক অসীম অন্ধকারে। মাঝখানের পথটুকুতে আলো জ্বলে, নেভে, আবার জ্বলে; যাত্রীর কোলাহল জেগে ওঠে। তারা ভিড় করে চলে যায় সেই দিগন্তের পারে।

সেই বহু যাত্রীর পায়ে-চলা পথটির দিকে তাকিয়ে একবার লোভ হল যে এর ধূলার আবরণ সরিয়ে দেখি, পথটি কি দিয়ে তৈরী।

যাঁরা জ্ঞানী গুণী, পাকা লোক বলে যাঁদের খ্যাতি আছে, তাঁরা বল্লেন, কর কি? তুমি তো আচ্ছা অর্ব্বাচীন! ধূলোর আবরণ সরালে যে পথ চৌচির হয়ে ফেটে যাবে! ঐ আবরণইতো ওকে সূর্য্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা করে আসছে!

ভাবলুম, তাই বুঝি বা হবে, এত পথিকের চলার পথ আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে নষ্ট করে দেব! থাক্ পথ যেমনটি আছে তেমনটি থাক্, দরকার নেই আমার তার আবরণ ঘুচিয়ে।

কিন্তু লোভ বলে যে বস্তুটির অস্তিত্ব আমাদের প্রথম পুরুষকে স্বর্গচ্যুত করেছিল সেই লোভ আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভয়ে ভয়ে পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই অতি সন্তর্পণে পথিকের ভিড় যখন কম এমন এক গভীর রাত্রে উঠে সেই পথের ধারে গেলুম। কানে এল কান্নার শব্দ। সেই পথের ধূলোর উপর শুয়ে পড়ে কান পেতে শুনলুম, সেই ধূলোর তলা থেকে কি আকুল কান্নার শব্দই না আসছে! তাড়াতাড়ি সেই অন্ধকার রাতে জোনাকি পোকার আলোতে ধূলো সরিয়ে দেখি, শত শতাব্দীর নারীর চূর্ণবিচূর্ণ কঙ্কালের স্তূপ, তারি অস্থি দিয়ে সেই পথ তৈরী, তারি কান্না রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে দূর সমুদ্রের গুঞ্জনের মত শোনা যাচ্ছিল। নারীর বুকের রক্ত-চোয়ানো যে মৃত্তিকা দিয়ে সেই পথ তৈরী হয়েছিল তারি একটি ধারে বসে অতীতের এই পথের ইতিহাস শুনলুম। পথ বল্‌লে যে—

সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ থেকেই পুরুষ আর নারীর দৈহিক শক্তির তারতম্য সূচিত হয়েছে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষকে আর নারীকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ করতে হবে বলে তাদের দৈহিক শক্তির পার্থক্য ছিল। সন্তান যাকে বহন করতে হবে, সন্তান যাকে পালন করতে হবে, তাকে তো কিছু পরিমাণে স্থিতিশীল হতেই হবে। সে সন্তানকে ঝড়-ঝঞ্ঝা রৌদ্র-বৃষ্টি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে আশ্রয় রচনা করবে গহ্বরে গুহায়, পাতা দিয়ে রচনা করবে কুটীর। প্রাণকে যে স্থিতির দ্বারা রক্ষা করবে সেই নারীর দৈহিক শক্তি, প্রাণকে যে গতির দ্বারা মুক্তি দেবে বৃহতের ক্ষেত্রে, সেই পুরুষের চেয়ে হীন তো হবেই।

অহর্নিশি দ্বন্দ্ব করতে হয়েছে যে পুরুষকে! প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আহার্য্য ও ভোগ্যদ্রব্যের বণ্টন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত দ্বন্দ্ব কত সংগ্রাম কত রক্তপাত! ওদিকে আবার নারীরও সন্তান ধারণ ও পালন করবার জন্য যে দৈহিক ও মানসিক উপযুক্ততার প্রয়োজন আছে তারি সৌষ্ঠব-সাধনায় তার যুগ-যুগান্তর কেটে গেছে। কাজেই আদিম যুগের অসভ্য পুরুষ মনের দিক থেকে সেই যুগের অসভ্য নারীর চেয়ে ঢের বর্ব্বর অবস্থায় ছিল। পুরুষের মধ্যে কেবল সৃষ্টির আবেগই ছিল; সৃষ্টি ধারণ করবার সৃষ্টি রক্ষা করবার সহজ চেতনা ধৈর্য্য করুণার